রহস্য[illegible] (আকর) গ্রন্থ

মনোজিৎ বসু

আরতি এজেন্সি
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আমার এ-বই হাতে পেলে
সবচেয়ে যে খুশি হবে
— তার হাতে

কিশোর-ভাইবোনদের জন্তে লেখা আমার যে-সব গল্প এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে বারটি গল্প নিয়ে 'গল্পের মণিমেলা' গ'ড়ে উঠল। যাদের জন্তে লেখা তারা প'ড়ে যদি খুশি হয় তাহ'লেই আমার গল্প বলা সার্থক হবে।

'ভাই-বোন' আর 'রাত তিনটের সময়' বেরিয়েছিল 'কিশোর-বাংলায়', 'লালুর কারসাজি'—'প্রত্যহ'-পূজাসংখ্যা(১৩৪৯)য়' আর বাকিগুলি 'কৈশোরকে'। প্রত্যেক গল্পকে রূপায়িত করেছেন শিল্পী শ্রীশৈল চক্রবর্তী, আর মলাটের ছবিখানি এঁকেছেন আমার আত্মীয় শ্রদ্ধেয় শিল্পী শ্রীসমর দে।

বন্ধুবর শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি), 'কৈশোরক'-এর সহকারী সম্পাদক বন্ধু শ্রীসুধাংশু গুপ্ত, প্রীতিভাজন শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দে, শ্রীপরিমলচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীদুর্গেশচন্দ্র নিয়োগী আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্তবাদ জানাই। সবশেষে শ্রদ্ধেয় বন্ধু সুসাহিত্যিক শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রের নাম মুগ্ধচিত্তে স্মরণ করি। তাঁর সাহায্য না পেলে আমার এই গল্প-সঞ্চয়ন বের হ'তে অনেক বিলম্ব হ'তো।

দোলপূর্ণিমা   লেখক

কলিকাতা, ১৩৫০

কিসে বেশি আনন্দ

ছুটতে ছুটতে আরতি এসে হাজির। মা তখন দাওয়ায় ব'সে কি একখানা বই পড়ছিলেন। আরতি তাঁর গলাটি জড়িয়ে ধ'রে ব'লে উঠ্‌ল—"জানো মা, আমাদের গাঁয়ে এবার কি এসেছে?"

হাতের বইখানা সরিয়ে রেখে মা হেসে জবাব দেন—"কি রে?"

"বা-রে, শোনোনি বুঝি? কলকাতা থেকে মস্ত এক সিনেমা-কোম্পানি এসেছে। আমাদের ঐ থিয়েটার-হল্‌টাই তো তারা ভাড়া নিয়েছে। সেইখানেই যে আজ থেকে ছবি দেখানো শুরু হবে,—জানো না বুঝি?" একসঙ্গে এতগুলো কথা ব'লে আরতি একটু দম নেয়।

বিস্ময় প্রকাশ ক'রে মা তাকে জিজ্ঞাসা করেন—"কা'র কাছে শুন্‌লি রে?"

"আমি যে এইমাত্র ও-পাড়া থেকে আসছি মা। সেখানে তৃপ্তির দাদা গল্প করছিল। তাই শুনে এলাম। ওরা তো আজকেই যাবে। আমরা বুঝি যাব না?"—সম্মতির আশায় আরতি তাকায় মায়ের দিকে।

এমন সময় শিবুও এসে হাজির। শিবু আরতির দাদা। পিঠাপিঠি দুটি ভাই-বোন। কথায় কথায় দু'জনের ঝগড়া, আবার কথায় কথায় তাদের ভাব। বাপ-মায়ের বড় আদরের ছেলেমেয়ে।

শিবু এসেই আরতিকে বলে—"এই পাজিটা, জানিস্ আমাদের গাঁয়ে এবার কি এসেছে?"

"ইস্, জানিনা আবার! ভারি তো নতুন খবর নিয়ে এলেন! তোমার ঢের ঢের আগে জানি। ভেবেছিলে যে আরতিটাকেই চম্‌কে দেবে, না?—কিন্তু সে-ই আগে খবরটা এনে মাকে শুনিয়েছে।"

শিবু তখন আরতিকে জব্দ করবার জন্যেই যেন জিজ্ঞাসা করে—"আচ্ছা তুই তো সবই জানিস্—বল্ তো কোন্ ছবি শুরু হচ্ছে আজ থেকে?"

আরতি এইবার মুস্কিলে পড়ে। তৃপ্তির দাদার কাছে এটা তো শুনে আসা হয় নি! তা' হ'লেই বা কি! আরতি কি শিবুর কাছে হেরে যাবে নাকি! সে রকম মেয়েই সে নয়। তাই, সে যেন জানে এই ভাব দেখিয়ে ব'লে ওঠে—"ইস্, জানিনা বুঝি? জানি,—বলবো কেন?"

"ছাই জানিস্। জানলে তবে তো বল্‌বি!"—শিবু জবাব দেয়।

আরতি চ'টে যায় শিবুর কথা শুনে। রাগ দেখিয়ে বলে—"বেশ তো, আমি না হয় নাই জান্‌লাম। তুমি তো জানো!...বল্লেই পারো!"

"বলবো কেন?"

"তুমিও ছাই জানো। জানলেই তো বলবে?"—আরতি হেসে ওঠে খিল্‌খিল্‌ ক'রে।

এই ভাবে দু'জনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি চল্‌তে থাকে। মা তখন ব'লে ওঠেন—"তোরা যদি ঝগড়াই করবি তা হ'লে কে বল্‌বে শুনি? যে জানিস্‌ সেই ব'লে ফেল্‌ না বাপু। আমি তো আর জানি না।"

শিবু তখন মায়ের কাছটিতে এসে বসে। তারপর বলে—"জানো মা, তোমার এই মেয়েটা দিন দিন ভারি দুষ্টু হয়ে উঠ্‌ছে। জানে না, তবু বলবে জানি। তুমি ওকে বক্‌তে পারো না মা?"

মা হেসে জবাব দেন—"আচ্ছা আচ্ছা বকবো'খন। তুই এখন বল্‌ না কী পালা আরম্ভ হচ্ছে আজ।"

মায়ের আগ্রহ দেখে শিবু ব'লে ওঠে—"তোমার খুব ভালো লাগবে মা। 'চণ্ডীদাস' হবে। কানা-কেষ্ট নাকি ভারি সুন্দর গান করেছে। তুমি যাবে না মা?"

মা উত্তর দেবার আগেই আরতি বলে—"কেন যাবে না? একশোবার যাবে। মা কি কখনো 'টকী' দেখেছে, যে, যাবে না?...জানো মা, এ শুধু নির্বাক্‌ ছবি নয়, এ হচ্ছে সবাক্‌ চিত্র। এর মধ্যে সবাই কথা বলে, হাসে, নাচে, গান গায়। বায়োস্কোপের মতো ছবিও দেখবে আবার গ্রামোফোনের মতো পালাও শুনবে। উঃ কি মজা!"

আরতির দিকে তাকিয়ে শিবু তখন ব'লে ওঠে—"জানিস্‌ আরতি, থিয়েটার-ঘরটার সামনে আজ যা ভিড় হয়েছে—যেন রথযাত্রার মেলা। গাঁয়ের লোকেরা তো

আর 'টকী' দেখেনি। তাই ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী, সবাইকে নিয়ে তারা আসতে শুরু করেছে। শুধু কি তাই ? আশ-পাশের গ্রামগুলিতে যারা খবর পেয়েছে—তারাও আসতে শুরু করেছে। উঃ কি দারুণ ভিড়! যাবি আরতি ?"

মা তখন ব'লে ওঠেন—"এখন যাবি কি রে! 'টকী' কি দিনের বেলাতেই শুরু হয় নাকি ?"

মায়ের কথা শুনে ভাইবোন দু'জনেই হেসে ওঠে। শিবুই প্রথমে জবাব দেয়—"না মা, সন্ধ্যে থেকেই শুরু হবে। আরতিকে নিয়ে যাচ্ছি ভিড় দেখাতে। আর সেই ফাঁকে আমাদের টিকিট ক'খানাও নিয়ে আসব'খন। আগে টিকিট করলে ভালো জায়গা পাওয়া যাবে, তাই।"

আনন্দে নেচে ওঠে আরতি। "উঃ কি মজা! কি মজা!...দাঁড়াও দাদা, আমি কাপড়টা বদ্‌লে আসছি।... এক মিনিট!"—এই ব'লেই আরতি ছুটে যায় শোবার ঘরে। মা বাক্স থেকে টাকা বের ক'রে দেন ছেলের হাতে।

শিবুর মনে আজ ভারি আনন্দ। অনেকদিন পরে আবার টকী দেখতে পাবে এই আশায়। গাঁয়ে তো আর দেখবার জো নেই! এই তো প্রথম এলো এখানে। বহুদিন আগে বাবার সঙ্গে শিবু একবার গিয়েছিল কলকাতায়। তখন সেখানে সে টকী দেখেছিল। আরতিও ছিল সঙ্গে। সে অনেকদিনের কথা, ভালো ক'রে

মনেও নেই সে সব। তাই গাঁয়ে এবার সিনেমা এসেছে ব'লে ওরা আজ আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছে।

আরতির দেরি দেখে শিবু গলা ছেড়ে হাঁক দেয়—"এই আরতি, তোর হোলো ? না বাপু, তোকে নিয়ে আর পারা গেল না ! আয় না জল্‌দি !"

একটু বাদেই আরতি এসে পড়ে। দু'জনে চল্‌তে শুরু করে তখন। তাদের বাড়ি থেকে থিয়েটার-হল্‌টা বেশ কিছু দূর হবে। একটু যেতেই তারা দেখতে পায় সদর রাস্তার বড় পুলটার কাছে দুটি ছেলেমেয়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে। পরনে তাদের শতচ্ছিন্ন ময়লা কাপড়। চুল-গুলোতে মাস কয়েকের মধ্যে এক ফোঁটা তেলও বুঝি পড়েনি। দারিদ্র্যের কালিমা ছড়িয়ে পড়েছে তাদের সারা অঙ্গে।

"বাবু, একটা পয়সা !" ছেলেটি কাতর নয়নে শিবুর দিকে তাকায়।

"আমরা বড় গরীব দিদিমণি !"—মলিন মুখে মেয়েটা ব'লে ওঠে আরতির দিকে চেয়ে। শিবু পকেটে হাত দিয়ে দেখে একটি পয়সাও নেই। আছে শুধু টিকিট করবার টাকাটি। আরতিকে সঙ্গে নিয়ে তাই সে এগিয়ে পড়ে।

কিছুদূর গিয়ে আরতি জিজ্ঞাসা করে—"ওদের কিছু দিলে না কেন দাদা ? ওরা যে বড় গরীব !"

"তা জানি ভাই। কিন্তু আমার কাছে যে আর একটি

আধ্‌লাও নেই। থাকলে কি দিতাম না।···টিকিট করবার টাকাটি শুধু রয়েছে।"—শিবু জবাব দেয়।

আরতির মনে ব্যথা লাগে। সে বলে—"দেখলে দাদা, ওরা কত্ত গরীব! আমাদেরই মতো দুটি ভাইবোন—পথে পথে ভিক্ষা ক'রে বেড়াচ্ছে। পয়সার অভাবে রোজ হয়তো ওরা দু'মুঠো খেতেও পায় না।·· না দাদা, ফিরে চল।"

অবাক্ হয়ে শিবু জিজ্ঞাসা করে—"সেকি রে, কোথায় যাব? এই তো এসে পড়লাম। চল্, আগে গিয়ে টিকিট কিনে আনি।"

মুখ ভার ক'রে আরতি জবাব দেয়—"না দাদা, আজকে আর সিনেমায় যাওয়া হবে না। চল আমরা ফিরে যাই। এখনও ফিরে গেলে হয়তো ওদের দেখা পাব। ওদের জন্যে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।"

ওরা দু'জনে ফিরে আসে পুলের ধারে। ভিখারী ছেলেমেয়ে দুটি তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে। আরতি জিজ্ঞাসা করে—"আজকে তোমরা কিছুই পাওনি?"

"না দিদিমণি, সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে একটি আধ্‌লাও পাইনি এ পর্যন্ত। যাকে বলি সে-ই মুখ ফিরিয়ে চ'লে যায়।···কাল থেকে আমরা কিছুই খাইনি বাবু!"—কাতর কণ্ঠে ছেলেটি বলে শিবু আর আরতিকে।

আরতি তখন শিবুর সঙ্গে ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে যায় কাছেই একটা ময়রার দোকানে। সেখানে ওরা পেট ভ'রে খেতে দেয় ওদের। আরতির সে কি আনন্দ! চুপি চুপি

শিবুর কানে কানে সে বলে—"দেখছ দাদা, ওরা কেমন খাচ্ছে!" শিবু তাই শুনে জবাব দেয়—"আহা, সারাদিন কিছু খায়নি!"

খাওয়া হয়ে গেলে শিবু ওদের হাতে বাকি পয়সা-গুলো তুলে দেয়। ওরা তো অবাক্! এমন দয়া, এমন

ভালোবাসা তারা যে কোনদিনই পায়নি। যাবার সময় শিবু আর আরতির জয়গানে তারা উল্লাস প্রকাশ ক'রে যায়। আরতির হয় আনন্দ। শিবু হয় খুশি।

তারপর ওরা যখন বাড়ি ফিরে আসে, মা তখন জিজ্ঞাসা করেন, "কি রে, টিকিট কেনা হোলো তোদের ? বাস্ রে, সেই কখন গিয়েছিলি, আর এই এখন ফিরছিস্। দেখি দেখি, টিকিট দেখি !"

"না মা, আজকে আর সিনেমায় যাব না।"—শিবু বলে হাসিমুখেই।

মা তো অবাক্ হয়ে যান ছেলের কথা শুনে। বলেন, "সেকি রে, কি হোলো ?"

আরতি ব'লে ওঠে—"হ্যাঁ মা, টিকিট আজ আর কেনা হোলো না। আমাদেরই মতো তুটি ভাইবোন আজ সারাদিন না খেয়ে পথে পথে ভিক্ষা ক'রে বেড়াচ্ছিল, ভারি গরীব তারা। তাদের আমরা আজ পেট ভ'রে খাইয়ে দিয়েছি। জানো মা, কি ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছিল ওদের। ভারি কষ্ট হোলো দেখে। তাই আর না দিয়ে থাকতে পারলাম না। সিনেমা দেখে যে আনন্দ আমরা আজ না পেতাম, তা' পেয়েছি ওদের তুটিকে খাইয়ে।—না দাদা ?"

শিবু হেসে জবাব দেয়—"হাঁ মা, আরতি ঠিকই বলেছে।"

আনন্দে মায়ের মন ভ'রে ওঠে কানায় কানায়। তু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরেন শিবু আর আরতিকে। খুশি হয়ে বলেন—"লক্ষ্মী ছেলেমেয়ে আমার। এই তো চাই।"

শাস্তি

এ্যান্নুয়াল পরীক্ষা চল্‌ছে। আর একদিন বাকি। সেদিন হ'লেই শেষ।

পাশাপাশি দুটো ঘরে তখন পরীক্ষা শুরু হয়েছে। সেকেণ্ড ক্লাশের থার্ডপেপারের পরীক্ষা। এ ঘরে গার্ড দিচ্ছেন ভবতোষবাবু আর বিশ্বেশ্বরবাবু; আর, ও-ঘরে থার্ড মাষ্টার সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী আর হেড্‌পণ্ডিত মশাই।

তখন সবে আধঘণ্টা হয়েছে, এমন সময় এ ঘরের নরেন দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—"স্যার, ওঘর থেকে হীরুকে বের ক'রে দিলে স্যার!" নরেনের কথা শুনেই ছেলেদের লেখা বন্ধ হয়ে গেল। তারা কৌতূহলী হয়ে সবাই মুখ তুলে চাইল। কেউ যেন নরেনের কথাটা বিশ্বাস করতেই চায়না, এই ভাব।

দুর্গেশ ব'লে উঠ্‌ল—"যা যা, কী যে বলিস্‌ তার ঠিক নেই। হীরুকে বের ক'রে দিতে যাবে কেন?"

আরেকটি ছেলে তাকে সমর্থন ক'রে বল্লে—"ও তো আর খারাপ ছেলে নয় যে বের ক'রে দিতে হবে!"

নরেন তখন ওদের কথার জবাব দিতে গিয়ে ব'লে উঠ্‌ল—"কি জানি ভাই, আমি তো তাই দেখলাম ওই জান্‌লা দিয়ে। হেড্‌পণ্ডিত-মশাই খাতাখানা ওর হাত থেকে কেড়ে নিজেই ও হন্‌ হন্‌ ক'রে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।"

ভবতোষবাবু এইবার ব'লে উঠ্‌লেন—"নাঃ তোমরা বড্ড গোল করছ। অত ব্যস্ত হবার কি আছে? হীরুকে বের ক'রে দেবার কি কারণ থাকতে পারে? ও তো আর গদাই কি কানাই নয় যে নকল করতে যাবে! হয়তো ওর লেখা শেষ হয়ে গেছে, তাই খাতা দিতে বেরিয়ে গেল। ঐ দেখ না, তোমাদের রমেশ, সুধীর, দেবীদাস ওদের লেখাও প্রায় শেষ। দেড় ঘন্টার তো পরীক্ষা। তারও তো পঁয়তাল্লিশ মিনিট কেটে গেল, আর কতটুকু সময়ই বা। নাও নাও আর গোল ক'রো না, এবারে হাত চালাও।"

ছেলেরা আর কি করে, তখনকার মতো চুপটি ক'রে খাতার পাতায় মন দিল।

কিন্তু পরীক্ষার পর সবাই শুনতে পেল ব্যাপারটা সত্যি। তবে হীরুকে বের ক'রে দেওয়া হয়নি, ও নিজেই বেরিয়ে গেছে পরীক্ষা না দিয়ে। কিন্তু কেনই বা সে বেরিয়ে গেল আর কেনই বা পরীক্ষা দিল না, সেটাই হোলো ছেলেদের কাছে হেঁয়ালির মতো।

অবশেষে তাদের সকল সমস্যার সমাধান ক'রে দিল তাদেরই ক্লাশের একটি ছেলে, নাম তার অনুপম। হীরু যে ঘরে পরীক্ষা দিচ্ছিল, সেও সেই ঘরেই পরীক্ষা দিচ্ছিল। কাজেই প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে অনুপমের কথা শোনবার জন্যেই ছেলেদের মধ্যে আগ্রহ দেখা দিল বেশি ক'রে। অনুপম যা বল্লে, সংক্ষেপে তা' বল্‌তে গেলে এই দাঁড়ায়।

ক্লাশের গোবর্ধন, শশধর আর ঢোলগোবিন্দ ইস্কুল থেকে খাতা চুরি করতে ওস্তাদ। তারা জানে খাতা কোথায়

থাকে। যে ঘরটায় থাকে সেটা হচ্ছে ইস্কুলের দরোয়ানদের থাকবার একটা ঘর। দরোয়ানরা কাছেই কাজটাজ করে ব'লে ওটায় বড়, একটা তালাচাবি দেওয়া হয় না। তাই সময়মতো সুযোগ বুঝে ওরা খাতা চুরি ক'রে বাড়িতে নিয়ে আসে। তারপর রাত জেগে ভালো ভালো গোটা-কয়েক প্রশ্নের উত্তর ওতে লিখে রাখে। পরদিন পরীক্ষার হলে গিয়ে যদি দেখে সেই প্রশ্নগুলোই এসে গেছে, তখন তো মহাফুর্তি। বেশ কৌশল ক'রে তারা খাতা বদলে ফেলে।

এই ভাবে খাতা চুরি ক'রে বাড়ি থেকে লিখে নিয়ে গিয়ে ইস্কুলের খাতার সঙ্গে বদল ক'রে আসবার কথা হীরু শুনেছিল ঢোলগোবিন্দের কাছে। ঢোলগোবিন্দ হীরুদের পাড়াতেই থাকে। কি জানি কেন হীরুর মাথায়ও এই দুষ্টু বুদ্ধি চেপে গেল। সে ভাবলে থার্ড-পেপারে তো লিখতে হয় দুটো মাত্র প্রশ্নের উত্তর। তাও কি কি আসবে সে তো প্রায় সকলেরই জানা। কেননা ক্লাশে ভূধরবাবু ঐ প্রশ্ন দুটো নিয়ে এতো বেশি আলোচনা করেছেন পরীক্ষার আগে, যে ও দুটো না এসেই পারে না। কাজেই, ইস্কুল থেকে খাতা চুরি ক'রে এনে বাড়িতে ব'সে সে যদি ও দুটো প্রশ্নের জবাব লিখে নিয়ে যায় তাহ'লে ঢের বেশি নম্বর পাবে। এই ভেবে ঢোলগোবিন্দের দলে মিশে সেও একখানা খাতা চুরি ক'রে নিয়ে এল। কিন্তু ভেবে দেখলে না কতদূর অন্যায় কাজ সে করতে যাচ্ছে। এই রকমই হয়। দুষ্টবুদ্ধি কখন্ যে কার মাথায় কি ভাবে চেপে

বলে কেউ তা' বলতে পারে না। তখন দুষ্টবুদ্ধিটাই হয়ে ওঠে প্রবল, আর বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা যায় লোপ পেয়ে। হীরুরও ঠিক তাই হোলো।

পরীক্ষার সময় বেয়ারা যখন খাতা দিতে এলো, হীরু তাকে ইশারায় জানিয়ে দিল যে, তার আর খাতা লাগবে না, খাতা আছে। সুচতুর বেয়ারাও চট্ ক'রে ব্যাপারটা আঁচ ক'রে নিল। এ কাজ যে খোকাবাবুরা হামেশাই ক'রে থাকে তা' তারা জানে। আর জানে ব'লেই সেও ইশারায় তাকে জানিয়ে দিল, বখশিস্ কিন্তু চাই।

তারপর শুরু হোলো পরীক্ষা। থার্ডমাষ্টার ও পণ্ডিতমশাই প্রশ্নপত্র দিয়ে গেলেন। প্রশ্নপত্র পেয়ে সবাই বেশ খুশি। কেননা বহু অল্টারনেটিভ! আর ভূধরবাবু ক্লাশে যে যে প্রশ্নের উপর জোর দিয়েছিলেন খুব বেশি, সেগুলো তো এসেইছে। হীরুও একবার মুচকি হাসল প্রশ্নপত্র দেখে।

কিন্তু মুস্কিল হ'লো তার পরে। এখন সে কী করবে? চুপচাপ তো আর ব'সে থাকা যায় না। একটা কিছু লিখতেই হয়। কিন্তু কী সে লিখবে? যা হোক, প্রশ্ন-পত্রটাই আবার পড়া যাক্। একবার, দুবার, তিনবার ক'রে দশবার সে প্রশ্নগুলো প'ড়ে ফেল্‌লে। নাঃ এ ভাবে থাকা মহামুস্কিল। কোনদিন তো আর এমন কাজ করেনি। পাশের ছেলেটা আস্তে আস্তে বল্লে—"চুপ ক'রে বসে আছিস্ কেন রে? লেখ্ না।" হুঁ, লেখ্ না! বল্লেই হ'লো! ও তো জানে না, হীরু কী ক'রে ব'সে আছে। এইবার হীরুর

মাথায় নানান্ চিন্তা এসে তোলপাড় করতে শুরু ক'রে দিল। সে ভাবলে—

"যদি ধরা প'ড়ে যাই, ছি ছি কী লজ্জার কথা!

"কখনো তো আর এমন কাজ করিনি, কেন আজ করলাম?

"ধরা পড়লে আমার নিন্দে হবে, লোকের কাছে মুখ দেখাব কেমন ক'রে?

"ঐ বুঝি থার্ডমাষ্টার আমার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন, খালি তাকাচ্ছেন আমার দিকে।

"নাঃ, এ ভাবে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার চাইতে না দেওয়াই ভালো।"

শেষটায় হীরু আর স্থির হয়ে ব'সে থাকতে পারল না, উঠে দাঁড়াল। সব কথা সে গার্ড দুজনকে খুলে বল্ল। বল্ল না শুধু গোবর্ধন, শশধর আর ঢোলগোবিন্দের কথা। তারপর সে পণ্ডিতমশায়ের দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠল— "আমি আপনাদের সামনে ব'সেই আবার লিখে দিচ্ছি স্যার, আমাকে আরেকখানা খাতা দিতে বলুন, কখনো আর এমন কাজ করব না। কেন যে আজ—" কথাটা সে শেষ করতেই পারল না। লজ্জায় সারা মুখ তার রাঙা হয়ে উঠেছে। মুখ দেখলেই বোঝা যায় সত্যিই সে অনুতপ্ত।

কিন্তু থার্ডমাষ্টার সিদ্ধেশ্বরবাবু বল্লেন—"তা তো হয় না হীরু! তোমার আর পরীক্ষা দেওয়া চলবে না। তুমি পরীক্ষার নিয়ম ভঙ্গ করেছ।"

কাতরকণ্ঠে হীরু বল্লে—"সে তো আমি অস্বীকার

করছি না স্যার। সকল কথাই খুলে ব'লে দোষ স্বীকার করছি। তবু কি আমায় পরীক্ষা দিতে দেবেন না?"

হেড্‌পণ্ডিত মশাই হীরুর অবস্থাটা বুঝতে পারলেন। সস্নেহে তাই তার কাঁধে হাত রেখে বল্লেন—"আমরা তো কিছু বল্‌তে পারি না হীরু। হেড্‌মাষ্টার-মশাই আসুন, তিনি শুনে যা বলবেন তাই হবে। তিনি আজ জেলায় গেছেন, কালকে ফিরবেন। কালকেই সব হবে।"

অভিমানে হীরুর অন্তর কেঁদে উঠ্‌ল। লজ্জায় সে বেশিক্ষণ আর সেখানে দাঁড়াতেও পারছিল না। তাই খাতাখানা হেড্‌পণ্ডিত-মশায়ের হাতে দিয়ে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল। বুক ঠেলে তার তখন কান্না আসছিল।

এর পরের দিনের কথা। সেদিন আর কোনো পরীক্ষা নেই। ছেলেদের মধ্যে শুধু হীরুর কথা। ইস্কুলের উত্তরদিককার বড় বকুলগাছটার তলায় ব'সে তারা হীরুর বিষয় নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু ক'রে দিয়েছে। কী শাস্তি হয় কে জানে! সবার মনেই দারুণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। এমন সময় একজন এসে খবর দিলে—"জানিস, কাল থেকে হীরু যেন কি-রকম হয়ে গেছে, আবোল-তাবোল কি-সব বক্‌ছে। শেষটায় মাথাটাই বুঝি ওর খারাপ হয়ে গেল!" আরেকজন এসে খবর দিলে—"কাল রাত্রে হীরুর বাবা হীরুকে যা মেরেছেন সে আর বলবার নয়। উঃ হীরুর সে কি কান্না!" আরেকজন

এসে সব-চাইতে নতুন খবর দিল—"কাল রাত্রের ট্রেণেই হীরু পলাশগাঁ ছেড়ে চ'লে গেছে, তার আর কোনো পাত্তাই নেই।" কিন্তু আসলে কোনো খবরই সত্যি নয়। সবই গুজব। এ রকম অবস্থায় প'ড়ে একটা লোকের কি কি করা সম্ভব তাই বুঝে জনকয়েক ছেলে নানা গুজব রটিয়ে বেড়াচ্ছে।

এখানে যখন ছেলেরা এই সব আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় ক্লাসের গুটিকয়েক ছাত্র হেড্‌পণ্ডিত মশায়ের বাড়ি গিয়ে হাজির। তাদের মধ্যে সুশীল পণ্ডিত-মশাইকে জিজ্ঞাসা করল—"হীরুর কি হবে পণ্ডিতমশাই?" হেড্‌পণ্ডিতমশাই মুখ গম্ভীর ক'রে বল্লেন—"ফাঁসি!" হো হো ক'রে ছেলেরা সবাই হেসে উঠ্‌ল। নরেন বল্লে, "ওর কি তবে প্রমোশন হবে না?" পণ্ডিতমশাই ঠিক সেই ভাবেই জবাব দিলেন—"আগে ফাঁসি, তবে তো প্রমোশন! ফাঁসি হোক আগে। হেড্‌মাষ্টারমশাই সব শুনেছেন। আজকেই ইস্কুলে ওর ফাঁসির হুকুম দেবেন দেখে নিও। প্রমোশন তো তারপর। বুঝলে?" সবাই বুঝল! কেননা পণ্ডিতমশাই চিরকাল ঠিক এই ভাবেই কথা ব'লে থাকেন। ওঁর কাছ থেকে আর কিছু আদায় করা নেহাৎ দুঃসাধ্য। ছেলেরা তাই ইস্কুলের দিকে রওনা হোলো।

ঘণ্টা কয়েক পরের ব্যাপার। ইস্কুলের মাঠে ছেলেরা অর্থাৎ সেকেণ্ড ক্লাশের ছেলেরা দাঁড়িয়ে। বিচার দেখবার

জন্যে অন্যান্য ক্লাশেরও কয়েকজন ছাত্র এসে হাজির হয়েছে। এককোণে হীরু আর কয়েকটি ছেলে আছে ব'সে। হীরুর মুখখানি মলিন। তার সহপাঠীরা তাকে নানা কথা ব'লে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। গোবর্ধন, শশধর, ঢোলগোবিন্দও এসে দাঁড়িয়েছে আরেক কোণায়। এমন সময় শোনা গেল ভারী জুতোর মচ্‌মচ্‌ আওয়াজ।

হেড্‌মাষ্টারমশাই এসে ইস্কুলের সিঁড়ির ওপরে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে থার্ডমাষ্টার সিদ্ধেশ্বরবাবু, হেড্‌পণ্ডিতমশাই, ভূধরবাবু, পঞ্চাননবাবু প্রভৃতি আরও জনকয়েক শিক্ষক এসে উপস্থিত। সবারই মুখ বেশ গম্ভীর। বিশেষ ক'রে হেড্‌মাষ্টারমশায়ের। ছেলেরা দস্তুরমতো ভয় পেয়ে গেল। না জানি কি গুরুতর শাস্তি ঘটে। হীরুর দিকে চেয়ে হেড্‌মাষ্টারমশাই বল্লেন—"সবই আমি শুনেছি হীরু! তুমি খুব অন্যায় করেছ। তোমার মতো ছেলের ও কাজ করা উচিত হয়নি। এজন্যে তোমার গুরুতর সাজা পাওয়া দরকার তা' জানো?"

হীরু কিছু বল্লে না। শুধু মাথা নিচু ক'রে ব'সে রইলো।

হেড্‌মাষ্টারমশাই তখন গম্ভীর গলায় ডাকলেন—"শিউশরণ!" শিউশরণকে ডাকতেই ছেলেরা সবাই চম্‌কে উঠ্‌লো। নিশ্চয়ই এবার সে বেত হাতে ক'রে এসে দাঁড়াবে, তারপরেই শুরু হবে 'সপাং সপাং'।

কিন্তু শিউশরণের হাতে কী ও? বেতের পরিবর্তে খান কয়েক নতুন বই একটা লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা। হেড্‌-মাষ্টারমশাই সেই বইগুলো নিয়ে একটু হেসে হীরুকে বল্লেন

—"এই নাও তোমার শাস্তি।" হীরু তো অবাক। ছেলেরাও অবাক। শাস্তির পরিবর্তে এ যে পুরস্কার!

হেড্মাষ্টারমশাই তখন বল্লেন—"তুমি একটু অবাক হয়ে গেছ, না হীরু? কিন্তু এই তোমার প্রাপ্য। দোষ অনেকেই করে, কিন্তু নিজের ভুল বুঝতে পেরে তা'

স্বীকার ক'রে ক্ষমা চাইবার মতো সৎসাহস হয় ক'জনার? কিন্তু তুমি সেই সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছ। এ রকম সৎসাহস খুব কম বাঙালী ছেলেরই আছে। তাই তোমার এই প্রথম অপরাধটুকু আমরা সানন্দেই মার্জনা করলাম। আশা করি এবার থেকে তুমি আগের মতো হবে। সৎ পথে থেকে উন্নতি লাভ করবে।"

আনন্দে হীরুর চোখে জল এসে গেল। সে শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে হেড্‌মাষ্টারমশাইকে প্রণাম করল।

হেড্‌পণ্ডিতমশাই এবার হেসে ব'লে উঠ্‌লেন—"ফাঁসি তো হয়ে গেল, প্রমোশনের জন্যে আর চিন্তা ক'রো না। বুঝলে?" ছেলেরা সবাই হেসে উঠ্‌ল। মাষ্টারমশাইরাও যোগ দিলেন তাতে।

হাসি থামবার পর হেড্‌মাষ্টার মশাই একটু গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"তাই ব'লে ভেব না আসল যারা দোষী তারা ধরা পড়েনি। তারাও ধরা পড়েছে একটুখানি বুদ্ধির দোষে। এবার যে খাতার ওপরে রবার-ষ্ট্যাম্পের ছাপ দেওয়া হচ্ছে সেটা তাদের নজরেই আসেনি। তিনখানি খাতায় কোনো রবার-ষ্ট্যাম্পের ছাপ নেই। যাদের খাতা, তারা বুঝতেই পারছ! সকলের সামনে নাম ব'লে তাদের আর গৌরব বাড়াতে চাই না। আসছে কাল তাদের পুরস্কারের ঘটাটা একবার দেখে নিও!"

হেড্‌মাষ্টারমশায়ের কথা শুনে গোবর্ধন, শশধর আর ঢোলগোবিন্দ শিউরে উঠ্‌ল!

গঙ্গা-যমুনা

ভাড়াটে-বাড়ির ছুই অংশে আজ ছু'মাস হোলো ছুই পরিবার বেশ নিরুপদ্রবেই বাস ক'রে আসছিলেন। কিন্তু দিন ছুই হোলো তাঁদের আর মুখ দেখাদেখি নেই, কথা বলা তো দূরের কথা।

এক নম্বরে থাকেন মিঃ গঙ্গাধর গাঙ্গুলি, হাই-কোর্টের উকিল; তাঁর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, চাকর-বামুন মিলে জনা-সাতেক লোক। আর ছু'নম্বরে আছেন পণ্ডিত যমুনাপ্রসাদ তর্কবাগীশ, সংস্কৃতের অধ্যাপক। স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, চাকর-ঝি নিয়ে তাঁরাও সাত-আট জন হবেন।

পণ্ডিত যমুনাপ্রসাদ অতি সরল প্রকৃতির মানুষ, বিনয়ের অবতার, বিদ্যার জাহাজ। লোক হিসেবে মিঃ গঙ্গাধরও খারাপ নন, উকিল হিসেবে তাঁরও যথেষ্ট নাম যশ। যদিও তিনি পণ্ডিতের এক হাত প্রমাণ টিকি দেখে প্রথমটায় নাক সিঁটকে উঠেছিলেন—কিন্তু পরে তাঁর মনের পরিচয় পেয়ে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাঁতাতে বিলম্ব করেননি। ঠিক তেমনি যমুনাপ্রসাদও উকিলের কোট-পেণ্টালুন দেখে প্রথমটায় তাঁকে ঘৃণার চোখে দেখতেন, কিন্তু পরে যেদিন বুঝলেন লোকটা আর যাই হোক্ বিদ্বান্ তো বটে, সেদিন তাঁর সঙ্গে রীতিমত একটা আত্মীয়তার সম্বন্ধ পাতিয়ে বসলেন।

বাড়ির কর্তাদের মধ্যে যেমন ছিল গভীর ভাব, অন্দর-মহলের গিন্নীদের মধ্যেও তেমনি কোনো অসদ্ভাব ছিল না। এ-বাড়ির ছেলেমেয়েরা ও-বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলাধূলো করতো। এমন কি এ-বাড়ির চাকর, ও-বাড়ির চাকরের সঙ্গে এক-ছাতে ঘুমুতো।

কিন্তু হঠাৎ কোত্থেকে এই দুই বন্ধু-পরিবারের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি দেখা দিল। একদিন যেখানে গলায় গলায় বন্ধুত্ব, আজ সেখানে রীতিমত শত্রুতা। কেউ কাউকে দেখতে পারে না। এ-বাড়ির জানালায় কেউ দাঁড়ালে ও-বাড়ির জানালা তক্ষুনি বন্ধ হয়ে যায়। এ-বাড়ির কর্তা কাটা মাছ কিনলে, ও-বাড়ির কর্তা গোটা মাছই কিনে ফেলেন। দুই চাকর এখনো ছাতে শোয় বটে, কিন্তু মাঝখানে একটা ভাঙা তক্তপোষ দিয়ে তারা পার্টিশানের ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছে।

এই বিবাদের কারণ বিশেষ কিছুই নয়—সামান্য একটা কুকুর। কোত্থেকে চেন ছিঁড়ে সে পালিয়ে চ'লে আসে এই ভাড়াটে-বাড়ির দোরগোড়ায়। তখন গাঙ্গুলির ছেলে হরেন আর তর্কবাগীশের ছেলে বিশু তাকে দেখতে পায়। কিন্তু গোল বাধে তারপর—কুকুরের প্রভুত্ব নিয়ে। হরেন তাকে জোর ক'রেই হরণ ক'রে নিয়ে যায় নিজেদের বাড়িতে। বিশু গিয়ে তর্কবাগীশের কাছে নালিশ জানায় হরেনের বিরুদ্ধে।

বিশুর মতে কুকুরটা তারই প্রাপ্য; যেহেতু সে যদি না পেছন থেকে তাকে আগলাতো তাহ'লে হরেনের কি

সাধ্য যে তাকে পাকড়াও করে । কিন্তু হরেন বলে—'আমি কত কষ্ট ক'রে ওকে ধরেছি,—ও আমারই ।' কাজেই ব্যাপারটা গুরুতর আকার ধারণ করে ।

তারপর থেকেই ঝগড়ার পাকাপাকি একটা বন্দোবস্ত । রীতিমত অসহযোগ আন্দোলন ।

তর্কবাগীশ-গিন্নী তাঁর মেয়েকে উদ্দেশ ক'রে বলেন—'ফের যদি ও-বাড়ির মিলির সঙ্গে তোমায় মেলামেশা করতে দেখি তো মজাটা টের পাবে'খন ।' ও-বাড়ির গাঙ্গুলি-গিন্নী তখন যেন ইচ্ছে ক'রেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলেন—'মিলির দায় প'ড়ে গেছে বন্ধুত্ব পাতাতে । খবরদার মিলি, পণ্ডিতের মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছ, কি বুঝেছ !'

ভোরবেলা উঠে যদি তর্কবাগীশের বড়ছেলে চীৎকার ক'রে উপনিষদের শ্লোক মুখস্ত করে, তাহ'লে গাঙ্গুলির মেজছেলে লেপের মায়া ত্যাগ ক'রে টেবিলে গিয়ে শুরু ক'রে দেয়—'Akbar was a great king.'—ইত্যাদি ।

ঝগড়াটা আরো বেশি ক'রে বাধলো সেদিন, যেদিন গাঙ্গুলির এক আত্মীয়ের পিস্‌তুতো ভাইয়ের মামা কালোয়াতি শুরু করলেন । উঃ সে কি কালোয়াতি ! প্রাণ যায় আর কি ! এক 'সা-রে' সাধতেই তাঁর সে কি প্রাণান্ত সাধনা । পাকা পঁচিশ মিনিট ধ'রে 'সা-রে, সা-রে' ক'রে চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ ক'রে দিলেন ! গাঙ্গুলি-পরিবার তাতে বিচলিত হলেন না বিন্দুমাত্র ।

কিন্তু তর্কবাগীশ হেন সরল-প্রকৃতির মানুষও গেলেন রীতিমত ক্ষেপে ।

গায়াই কিনে ফেল্‌লেন। যেই ও-বাড়ির সেই পিস্‌তুতো-ভাইয়ের মামা সা-রে ব'লে চেঁচাতে শুরু করেন, তক্ষুনি এ-বাড়ির গাধা মার খেয়ে তারস্বরে যে রাগিণী বের করে তাতে ও-বাড়ির সা-রে গা-মা চাপা প'ড়ে যায়।

মিঃ গাঙ্গুলি বলেন—'তর্কবাগীশ, ভাল হচ্ছে না!'

তর্কবাগীশ জবাব দেন—'গাঙ্গুলি, সাম্‌লে চ'লো!'

শেষটায় যখন কোনো পক্ষই হারবার নামটি পর্যন্ত করে না, তখন উভয় পক্ষই মনে মনে ঠিক ক'রে ফেল্লে যে, বাড়ি বদল করতে হবে,—আর এমন বাড়ি খুঁজতে হবে যেখানে পরস্পরের দেখা হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

চল্‌লো বাড়ি দেখার পালা, টালা থেকে টালীগঞ্জ অবধি। শেষটা দর্জিপাড়ায় এক ফ্ল্যাট ভাড়া ক'রে এলেন—মিঃ গঙ্গাধর।

ওধারে সন্ধ্যার দিকে বাড়ি ফিরে তর্কবাগীশ গাঙ্গুলি-পরিবারকে শুনিয়ে শুনিয়ে বল্লেন—'এমন বদ্‌লোকের সঙ্গে থাকে কোন্—! কালই বাড়ি বদল করব!'

পরদিন ভোরবেলা ঠেলাগাড়ি বোঝাই ক'রে গাঙ্গুলি-পরিবারের জিনিস-পত্র রওনা হোলো দর্জিপাড়ার নতুন বাড়িতে। গাঙ্গুলি-গিন্নী বেশ জোরেই বল্লেন—'বাঁচা গেল বাবা এ্যাদ্দিনে।' নতুন বাড়িতে সব জিনিসপত্তর রেখে তালাচাবি দিয়ে তাঁরা ফিরে এলেন খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে পুরোনো বাড়িতে। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে সেই সন্ধ্যেবেলাই তাঁরা চ'লে যাবেন।

তর্কবাগীশ-পরিবার কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার পাট সকাল-

সকাল চুকিয়ে ফেলে দুপুরের আগেই তাঁদের নতুন ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হলেন। তর্কবাগীশ-গিন্নী নিশ্বাস ছেড়ে বল্লেন—'রক্ষ্য পেলুম বাবা এ্যাদ্দিন পরে।'

তর্কবাগীশের মেয়ে ঊষা মায়ের কাছে এসে বল্লে—'কিন্তু মা, এতবড় বাড়িটায় কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে না? সামনের ঐ ফ্ল্যাটটায় ভাড়াটে এলে বেশ হয়!'

ঊষার মা জবাব দিলেন—'শুনছি তো, আজকেই নাকি

ওদিককার ফ্ল্যাটে ভাড়াটে আসবে। বাড়িওয়ালার বৌ তো ব'লে গেল সে কথা।'

'সত্যি নাকি? ওঃ কি মজা! আলাপ করবার লোক না পেলে কি ভালো লাগে ছাই! কিন্তু মা, বাবাকে বলো এক্ষুনি গাধাটা বিক্রী ক'রে দিয়ে আসতে। শেষটায় গাধার চীৎকারেই হয়তো ভাড়াটেরা পালিয়ে যাবে।'—মেয়ে হেসে জবাব দিল।

তর্কবাগীশ তক্ষুনি তিনটাকা ক্ষতি স্বীকার ক'রে পাশের তিনকড়ি ধোপার কাছে গাধাটা বিক্রী ক'রে এলেন।

আপদ চুকলে পর তিনি বসলেন তামাক সাজতে। আর, গিন্নী মনের আনন্দে চড়িয়ে দিলেন পায়েস। নতুন ভাড়াটেরা এলে ডেকে তাঁদের খাওয়াবেন। অর্থাৎ, বন্ধুত্ব পাতাবার একটু ছল আর কি!

সন্ধ্যেবেলায় সেই নতুন ভাড়াটেরা এসে হৈ চৈ শুরু ক'রে দিল। তর্কবাগীশ পরিবারেও দেখা দিল চাঞ্চল্য।

তর্কবাগীশ-গিন্নী তখন বাটি ভ'রে পায়েস সাজিয়ে তাঁদের ডাকতে পাঠালেন। ডাকতে গিয়ে তর্কবাগীশ দেখেন—সর্বনাশ! ভাড়াটে আর কেউ নয়,—গঙ্গাধর গাঙ্গুলি!

মায়ের পূজা

লতাপাতায় ঘেরা ছোট্ট একটি কুটীর। পাশ দিয়ে তার ব'য়ে চলেছে ছোট্ট একটি নদী। এই পর্ণকুটীরে বাস করে দীনু বাগ্দীর বিধবা স্ত্রী, আর তার একমাত্র ছেলে দুলাল। ছেলেটির বয়স বছর বারো। গায়ের রঙ যদিও কালো, তা হ'লেও কিন্তু ওর চেহারা সুন্দর। মা আদর ক'রে ছেলেকে ডাকেন দুলী।

দেখতে দেখতে পুজো এসে পড়ল। সমস্ত বাংলা-দেশে তখন একটা সাড়া প'ড়ে গেছে। সবাই পুজোর কথা ভাবছে। ছোট ছেলেরা তাদের মা-বাপের কাছে বায়না ধরেছে—পুজোর সময় নতুন কাপড় নতুন জুতো কিনে দেবার জন্যে; দোকানীরা পুজোর মালে বোঝাই করেছে দোকান; ইস্কুলের ছাত্র মাষ্টার সবাই পুজোর ছুটির কথা ভাবছে। সবারই মনে অপূর্ব এক আনন্দ।

দুলীদের গাঁয়ের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী জমিদার-বাড়িতেও চল্‌ছে পুজোর আয়োজন। প্রতিমা তৈরী হচ্ছে সেখানে। তাই দেখবার জন্যে গাঁয়ের ছেলে-ছোকরারা জমিদার-বাড়িতে এসে ভিড় করেছে। দুলীও সেই ছেলেদের একজন।

এইখানে জমিদার-মশায়ের একটু পরিচয় দিতে হচ্ছে। তাঁর নাম প্রতাপ রায়। গাঁয়ের লোক সবাই এই জমিদারের

নামে ভয় পায়। এঁর অন্যায় অত্যাচারে গ্রামবাসী সবাই উৎপীড়িত। কেউ যদি এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে যায়, তাহ'লে তার আর রক্ষা নেই।

দুলী গাঁয়ের এক পাঠশালাতেই পড়ে। পড়াশোনায় বেশ ভালো ব'লে পাঠশালার পণ্ডিতমশাই ওকে স্নেহ করেন। আজ সেই পণ্ডিতমশাইকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি এসে দুলী ডাকল—'মা'।

মা বেরিয়ে পণ্ডিতমশাইকে বসবার আসন দিয়ে প্রণাম করলেন। দুলী বল্লে, 'মা, এবার আমাদের বাড়িতে দুর্গাপূজা করব মা।' মা হেসে জবাব দেন, 'তা কি হয় বাছা, আমরা যে ছোটজাত,—সমাজের ঘৃণ্য। আমাদের তো দেবী-পূজা করবার অধিকার নেই বাবা।' দুলী তখন পণ্ডিতমশাইকে দেখিয়ে বলে, 'মা, পণ্ডিতমশাই বলেছেন, দেবতা সকলের,—তিনি ব্রাহ্মণের, তিনি আমীরের, তিনি গরীবের, তিনি শূদ্রের,—তিনি সকলের। তাঁকে পূজো করবার অধিকার সকলেরই আছে। এবার আমি পূজো করবই। তুমি আমাকে বাধা দিও না মা।'

মা পণ্ডিতমশায়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'পণ্ডিত-মশাই?' পণ্ডিতমশাই সহাস্যে জবাব দেন, 'ভয় কি মা, দেবতার চরণে অঞ্জলি দেবার অধিকার তোমারও আছে। আমি নিজে ব্রাহ্মণ, আর তোমার এই ছেলের প্রথম পূজায় আমিই করব পৌরোহিত্য। তুমি আয়োজন কর মা।'

বাসন্তী রঙের কাপড় প'রে ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করছে পূজোর দিন। জমিদার-বাড়িতে মহাসমারোহে চল্‌ছে পূজা। নায়েবমশাই, পূজার সকল কাজ যাতে ভালো ভাবে সম্পন্ন হয় তার ব্যবস্থা করছেন। হঠাৎ সেখানে একটি ব্রাহ্মণ এসে হাজির। এসেই সে বল্‌তে লাগল— 'কলিকাল! কলিকাল! বুঝলেন নায়েবমশাই, ঘোর কলি!' নায়েবমশাই কিছুই বুঝছিলেন না, তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বলছেন, চক্রবর্তী-মশাই? আমি ত কিছুই বুঝছি না।' চক্রবর্তী-মশাই বল্‌তে লাগলেন—'জমিদার প্রতাপ রায়ের এলাকায় এই অনাচার, এই অনাছিষ্টি! হায় হায়, আমরা যাবো কোথা! বুঝলেন কিনা নায়েবমশাই, দীনু বাগ্দীর ছেলেটা পূজো করছে, আর ওই পাঠশালার দুগ্‌গো ভট্‌চাজ কিনা তার পুরোহিত! কি সব্বনেশে কথা মশাই, কি সব্বনেশে কথা!'

নায়েবমশাই এবার বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। বল্লেন—'আপনি ঠিক বলেছেন চক্রবর্তী-মশাই, ঘোর কলি। আমি এখুনি জমিদার-মশাইকে খবরটা দিতে চল্লুম।' এই ব'লে তিনি জমিদারের অন্দরে গিয়ে ঢুক্‌লেন।

ওদিকে দুলীর কত আনন্দ! তার বাড়িতে আজ পূজো। পণ্ডিতমশাই নিজে পূজো করছেন। দুলী মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিতে গিয়ে প্রার্থনা করলে, 'মা, এইভাবে তুমি বছরের পর বছর আমাদের এই কুঁড়েঘরে আসতে ভুলো না মা। মা, তোমার আশীর্বাদ থেকে যেন বঞ্চিত

না ছুই।' এই ব'লে তুলী মা-তুর্গার পায়ে প্রণাম করতে মাথা হেঁট করল।

হঠাৎ তার পিঠে পড়ল শপাং শপাং ক'রে চাবুকের ঘা। নায়েবমশাই বল্লেন, 'নে নে, ঢের হয়েছে, আর জ্বালাতে হবে না।' এই ব'লেই তিনি সেপাইকে হুকুম দিলেন প্রতিমা ভেঙে দিতে। তুলী যেন কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নায়েবমশাই বল্লেন, 'চুপ!' তারপর তুলীকে আর পণ্ডিতমশাইকে বেঁধে নিয়ে চল্‌ল তারা। তুলীর মা নায়েবমশায়ের পায়ে প'ড়ে কত কান্নাকাটি করল, কিন্তু নায়েবমশাই শুধু জবাব দিলেন, 'বাগ্দী হয়ে প্রতাপ রায় জমিদারের এলাকায় যে পুজো করতে চায় তার উপযুক্ত শাস্তি না দিলে দেবী যে অপ্রসন্না হবেন!'

জমিদারের আদেশে তুলীর হোলো গুরুতর শাস্তি। আর এই পুজোয় পৌরোহিত্য করার জন্যে সামাজিক দণ্ড পেলেন পণ্ডিতমশাই। তাঁকে পাঠশালা থেকে বরখাস্ত করা হোলো। সমাজ থেকে সেইদিনই তাঁকে করা হোলো একঘরে। পণ্ডিতমশাই হাসিমুখে সেই শাস্তি মাথা পেতে নিলেন।

তুলী বাড়ি ফিরে এসে কাঁদতে কাঁদতে তার মায়ের বুকে ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু এদিকে হোলো এক আশ্চর্য ঘটনা। নায়েবের ছেলে সেদিন সন্ধ্যার সময় জমিদার-বাড়ি ছুটে এসে বল্লে, 'দাদামশাই, আমার বাবাকে বাঁচান!'

প্রতাপ রায় বিস্মিত হয়ে বল্লেন—'কি হয়েছে তার? দিব্যি ভালো মানুষ, এই যে খানিকক্ষণ হোলো বাড়ি চ'লে গেলেন।'

'দুলী-বাগ্‌দীর বাড়ি থেকে এসেই তিনি হঠাৎ কি যেন

কেমন হয়ে গেছেন। হাত দুখানা নাড়তে পারছেন না, একেবারে অবশ হয়ে গেছে। কথা পর্যন্ত কইতে পারছেন না। কি করব বলুন তো?'

জমিদার প্রতাপ রায় ভাবতে লাগলেন—'কেন এমন হোলো?' তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর বাড়ির বিচক্ষণ কবিরাজকে নায়েবের চিকিৎসার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। ক[illegible] ফিরে এসে বল্লেন—'নায়েবমশাই বাতগ্রস্ত হয়েছেন। কঠিন ব্যাধি, সহজে আরোগ্য হবার নয়।'

সেদিন সন্ধ্যায় জমিদার-বাড়িতেও নানা বিঘ্ন ঘটতে আরম্ভ হোলো। প্রতাপ রায়ের একমাত্র ছেলেকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পুজো দেখবার সময় সে চাকরদের সঙ্গে বাইরে এসেছিল, তারপর আর তার খোঁজ নেই। চারিদিকে লোকজন ছুটতে আরম্ভ করল। পুজোর দিকে আর কারুরই লক্ষ্য নেই।

প্রতাপ রায় পাগলের মতো চীৎকার ক'রে বল্‌তে লাগলেন—'যদি আমার খোকাকে ফিরে না পাই, তবে আমি মায়ের মূর্তি এক্ষুনি বিসর্জন দেব। চাই না এমন মায়ের পুজো দিতে। যে মা সন্তানের বেদনা বোঝে না, যে মার আগমনে আমার বাড়িতে এত অশান্তি—'

হঠাৎ প্রতাপ রায়ের গুরুদেব সেই সময় সেখানে এসে উপস্থিত। তিনি সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী। সারা বৎসর তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ান, কিন্তু প্রতিবৎসর পূজার সময় একবার তিনি প্রতাপকে এসে দেখে যান।

গুরুদেবকে দেখে প্রতাপ রায় যেন প্রাণে বল পেলেন, তাঁকে প্রণাম ক'রে বল্লেন,—'বাবা, সর্বনাশ হয়েছে!'

সন্ন্যাসী গম্ভীর ভাবে বল্লেন,—'কি হয়েছে বাবা ?'

প্রতাপ রায় তখন খুলে বল্লেন সব কথা।

গুরুদেব শুনে বল্লেন—'হতভাগ্য প্রতাপ! কি করেছ তুমি! মা জগজ্জননী কি কেবল তোমারই মা ? তিনি কি বিশ্বজগতের নন্ ? তোমার আশ্রিত গরীব প্রজা ব'লে তার উপর তোমার এ কি অত্যাচার! মা সইবেন কেন ?'

প্রতাপ গুরুদেবের পা ছ'খানি জড়িয়ে ধ'রে বল্লেন—'বাবা, আমাকে বাঁচান, আমার খোকাকে কি ক'রে ফিরে পাব বলুন!'

গুরুদেব বল্লেন—'তোমায় এক্ষুনি ছুলী-বাগ্দীর বাড়ি যেতে হবে। ছুলী আর তার মায়ের কাছে মার্জনা চাইতে হবে তোমার অপরাধের জন্যে। যদি রাজি হও, চল,—হয়ত জগদম্বা তাহ'লে তোমার প্রতি কৃপা করতে পারেন।'

জমিদার প্রতাপ রায়ের অভিমান ও গর্ব কোথায় গেল ভেসে! গুরুদেবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছুলী-বাগ্দীর বাড়ি এলেন। ছুলী তখনও কাঁদছিল, তার সারা পিঠে বেত্রাঘাতের চিহ্ন,—আর বাইরে দেবীমূর্তি ভগ্ন, মঙ্গল-কলস প্রাঙ্গণে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

সন্ন্যাসী দেখে শিউরে উঠলেন।

প্রতাপ ছুলীকে বুকে নিয়ে বল্লেন, 'বাবা, আমায় ক্ষমা কর!—চল আমার বাড়ি!'

ছুলী কথা বলতে পারছিল না। তার সারা শরীর আঘাতের বেদনায় জ্বলছিল। সব দেখে তার মনে হচ্ছিল, এ কি স্বপ্ন নাকি!

ছুলীর মা সন্ন্যাসীকে ও জমিদারকে প্রণাম ক'রে বল্লেন—'আমরা যে বাগ্দী দাদাঠাকুর, আমাদের বাড়িতে কি মা আসেন? আমরা অন্যায় করেছিলাম, তাইত ছুলী আমার—'

সন্ন্যাসী বল্লেন, 'না মা, কোনো অন্যায় তুমি করনি। মা যে তোমার, আমার,—পৃথিবীর সকলের!'

প্রতাপ রায় বাড়ি এসে যেমন পূজার দালানের কাছে দাঁড়িয়েছেন অমনি দেখেন, খোকা, তাঁর খোকা সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাঠশালার পণ্ডিতমশাই তাকে আদর করছেন।

পণ্ডিতমশাই কি-ভাবে একজন গুণ্ডার হাত থেকে খোকাকে রক্ষা করতে পেরেছেন সে কথা বল্লেন।

জমিদার, এবং অন্তঃপুর থেকে জমিদার-গৃহিণী, ছুটে এসে পণ্ডিতমশাই ও সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লেন।

সেদিন সন্ধ্যায় বাগ্দী-বাড়ির পূজার প্রাঙ্গণে যেমন জনতা হয়েছিল, তেমন জনতা জমিদার-বাড়িতেও হয়নি।

ভাই-বোন

লিপির সঙ্গে অসীমের ভারি ভাব। তারা পাশাপাশি দুটি বাড়িতে থাকে। লিপির বাবা বছর খানেক হোলো দেবলপুর হাইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার হয়ে এসেছেন। আর অসীমরা বরাবরই সেখানে থাকে। অসীমের বাবা সেখানকার জমিদারী-স্টেটের ম্যানেজার।

লিপির চেয়ে অসীম বছর তিনেকের ছোট। তাই সে তাকে দিদি ব'লেই ডাকে। অসীমের খেলার সাথী, অসীমের বেড়াবার সঙ্গী,—অসীমের সব কিছুই এখন তার লিপিদি। লিপিদিকে না হ'লে তার যেন এখন চলেই না। মা তাই ঠাট্টা ক'রে যখন বলেন—"দিদিকে পেয়ে অসীম যেন তার মাকে একেবারে ভুলেই গেছে"—তখন গাল ফুলিয়ে অসীম তাতে জবাব দেয়,—"হুঁ, তুমি জানো!" তার কথা বলবার ভঙ্গী দেখে লিপি হেসে ওঠে খিল্‌ খিল্‌ ক'রে।

লিপির ভারি দুঃখ ছিল ছোট্ট একটি ভাইয়ের জন্যে। কিন্তু অসীমকে পেয়ে তার সে দুঃখ আর নেই। নিজের ছোট ভাইয়ের মতোই সে ভালোবাসে অসীমকে। তার অসুখ হ'লে নিজের হাতে তার শুশ্রূষা করে, গল্প ব'লে তার অসুস্থ-মনকে দেয় সান্ত্বনা। অসীম যেদিন স্কুল থেকে প্রাইজ এনে লিপির হাতে দিয়েছিল সেদিন তার কী

আনন্দ! সবাইকে সে দেখিয়েছিল তার ছোট ভাইয়ের পুরস্কার। ওরা যেন একই মায়ের দুটি ছেলেমেয়ে।

অসীম যেমন তার লিপিদিকে ছেড়ে থাকতে পারে না মোটেই, তাকে দেখতে না পেলে সারা বাড়ি খুঁজে বেড়ায় তন্ন তন্ন ক'রে, লিপিও তেমনি তার ছোট ভাইটিকে দেখতে না পেলে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

অসীমের মা যখন বলতেন, "লিপি আমার লক্ষ্মী মেয়ে", —তখন লিপির মাও জবাব দিতেন,—"সত্যি দিদি, অসীম যেন সোনার টুক্‌রো ছেলে। এমন ছেলে আর দুটি দেখিনি।" অসীম আর লিপি দুজনেই এ কথা শুনে হেসে উঠ্‌ত। কি সুন্দর, কি আনন্দোচ্ছল তাদের ঐ হাসি! তাদের এই আনন্দ দেখে মায়ের মনও ভ'রে যেত আনন্দে।

লিপির ছিল পোষা একটা ময়না। বেশ কথা বলতে পারত সে। তাকে লিপি অনেক ক'রে বলতে শিখিয়েছিল —'অসীমবাবু দুষ্টু ছেলে।' অসীম তাই শুনে বলত, "দাঁড়াও, তোমাকেও আমি জব্দ করব একটা ময়না এনে। তাকেও বলতে শেখাব—'দস্যিমেয়ে লিপিদিদি', কেমন হবে তখন? বুঝবে তখন মজাটা।"

দুজনকে জব্দ করতে দুজনেই উপায় খুঁজে বেড়ায়। এতে যেন ওদের কত আনন্দ। মাঝে মাঝে অভিমানও যে না হয় তা নয়, কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্যে। কতক্ষণ আর কথা না ব'লে থাকতে পারবে বল। সকালবেলায়

হয়তো ওদের ঝগড়া হয়ে গেছে, কিন্তু [illegible] হ'লেই দেখবে ওদের মধ্যে কত ভাব। এমনি ওদের স্বভাব।

লিপিদের বাড়িতে ব'সে দুজনে ক্যারম খেলছে, এমন সময় খাঁচা থেকে ময়নাটা ডেকে উঠ্‌ল—"অসীমবাবু দুষ্টু

ছেলে।" লিপি হেসে উঠ্‌ল অসীমের দিকে চেয়ে। তাই দেখতে পেয়ে অসীম ব'লে ওঠে, "দাঁড়াও না, কালকে আমারও ময়না আসছে। হরি-সিং বলেছে, শিববাড়ির

মেলা থেকে সুন্দর একটা ময়না নিয়ে আসবে। তখন টের পাবে মজাটা। দস্যিমেয়ে লিপিদিদি—বুঝলে ?"

—"বেশ তো, আসুক না। এলেই বুঝি কথা বলবে ? তুই তাকে শেখাতে পারবি ? শেখানো যা কষ্ট। সে তোর কর্ম নয়।"

—"নাঃ আমার কর্ম নয়! তুমি জানো! তুমি যদি শেখাতে পার, তাহ'লে আমি পারব না কেন শুনি ?"

লিপি এবার দুষ্টুমি ক'রে বলে, "ঈস্, মুখের কথা আর কি! শেখাতে দস্তুরমতো কায়দা-কানুন জানা চাই, বুঝলি বোকারাম ? তুই তা জানিস্ ?"

অসীম এবার মুস্কিলে প'ড়ে যায়। ভাবে, সত্যিই হয়তো বা অনেক কায়দা-কানুন আছে যাতে ক'রে ময়নাকে কথা বলানো যায়। কিন্তু সে তো সে-সব জানে না। তাহ'লে তো লিপিদিকে মোটেই জব্দ করা যাবে না। কিন্তু মুখে সে-ভাব প্রকাশ না ক'রে বেশ গম্ভীর হয়েই সে জবাব দেয়, "হুঁঃ, জানি না আবার! তোমার চাইতে অনেক বেশি জানি,—তা জানো ?"

পরদিন অসীমের ময়না আসে। ছোট্ট সুন্দর কুচ্‌কুচে কালো এক ময়না। অসীমের সে কী আনন্দ। ছাতু ভিজিয়ে তাকে খাওয়ায়, ভাঙা একটা পেয়ালায় ক'রে দেয় জল। আর বলে, "বল্ তো ময়না, দস্যিমেয়ে লিপিদিদি!"

ময়না কিন্তু চুপ ক'রেই থাকে, কিছুই বলে না। অসীম

ভাবে, নিশ্চয়ই কোনো কায়দা আছে যার জন্যে সে তাকে কথা বলাতে পারছে না। লিপিদির মা নিশ্চয়ই জানেন। তাঁর কাছ থেকে চুপি চুপি শিখে আসতে হবে কায়দাটা। লিপিদিকে তো জব্দ করতেই হবে।

লিপিদের বাড়িতে এসে অসীম জিজ্ঞাসা করে, "লিপিদি কোথায়, মাসীমা ?"

—"কেন রে, এইতো সে ইস্কুল থেকে এসে তোদের বাড়িতে গেল। দেখা হয়নি বুঝি ?"

মাথা নেড়ে অসীম জানায়, না, দেখা হয়নি।

তারপর সে লিপির মায়ের কাছে এসে বসে, আস্তে আস্তে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা মাসীমা, ময়নাকে কথা বলাবার কায়দাটা তুমি জানো ? আমায় শিখিয়ে দেবে ? আমি কিছুতেই আমার ময়নাটাকে কথা বলাতে পারছি না। আর দেখ তো লিপিদির ময়নাটা কেমন কথা বলে।"

খাঁচা থেকে ময়নাটা অমনি ডেকে উঠ্‌ল, "অসীমবাবু দুষ্টু ছেলে, অসীমবাবু দুষ্টু ছেলে।"

শুনে অসীমের হোলো রাগ। সে তক্ষুনি ভেংচি কেটে ব'লে উঠ্‌ল—"হুঁ দুষ্টু। তুমি জানো, পাজি কোথাকার !"

লিপির মা এবার বুঝতে পারেন অসীম কেন এসেছে তাঁর কাছে ময়নাকে কথা বলাবার কায়দা শিখতে। তিনি তাকে বল্লেন, "কায়দা আবার কি রে অসীম! তুই ময়নাকে যা বল্‌তে শেখাবি তাই রোজ অনেকবার ক'রে

তাকে শোনাবি। তাহ'লেই দেখবি কিছুদিন বাদে তোর ময়নাও কথা বলতে শিখেছে। বুঝলি?"

—"বা-রে, লিপিদি যে বল্লে অনেক কায়দা-কানুন আছে!" বিস্মিত চোখে অসীম তাকায় লিপির মায়ের দিকে। তিনি তখন হেসে বলেন, "ওঃ তাই বুঝি তোকে বলেছে? ওসব বাজে কথা, বুঝলি? লিপিটার অমনি স্বভাব।"

অসীমের দুর্ভাবনা যেন কেটে যায়। সে তখুনি ছুটে যায় বাড়ির দিকে। কিন্তু গেটের কাছে পা দিতে না দিতেই লিপি এসে হাজির। অসীমকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে সে ব'লে ওঠে, "এই, কোথায় ছিলি রে তুই এতক্ষণ? সারা বাড়ি খুঁজে খুঁজে আমি হয়রান!"

—"মাসীমার কাছে এসেছিলুম ময়নাটাকে কি ক'রে কথা বলানো যায় তাই শিখতে।"

—"কেন, তুই না সব জানিস্?"

—"জানতুম। কিন্তু এখন আর মনে নেই কিনা! বুঝলে লিপিদি, এবার যখন আমার ময়নাটার কাছে যাবে তখন দেখবে সে কেমন ব'লে ওঠে—'দস্যিমেয়ে লিপিদিদি, দস্যিমেয়ে লিপিদিদি।' কেমন জব্দ হবে তখন। ময়নাকে দিয়ে আমায় দুষ্টু বলাবার মজাটা টের পাবে। বেশ হবে। মনটা আমার খুশি হবে।"

—"ঈস্, তোর ময়না আবার কথা বলবে? যা ছোট্ট এতটুকু রোগা টিংটিঙে তোর ময়না, ওটা বাঁচলে হয়।"

লিপির কথা শুনে অসীমের মুখখানা গম্ভীর হয়ে

যায়। সে বল্লে, "বেশ, আমার ময়না না হয় নাই বাঁচল, তোমার ময়না তো বাঁচবে।"

লিপি বুঝতে পারে অসীম রাগ করেছে। সে তাই ব'লে ওঠে, "রাগ করলি অসীম? তোর একটুতেই রাগ, ঠাট্টাও যদি বুঝিস্! তোকে নিয়ে আর পারি না। তুই একেবারেই ছেলেমানুষ!"

অসীম এবার মুখে হাসি এনে জবাব দেয়, "হুঁ, রাগ করেছি! তুমি জানো? কখন আবার রাগ করলুম? সব তাতেই তোমার ইয়ে, হ্যাঁ।"

লিপি হাসে তার কথা বলবার ভঙ্গী দেখে।

দুজনের কেউই কাউকে আঘাত দিতে পারে না, পাছে তাদের ছাড়াছাড়ি হয় এই ভয়। অসীম ভাবতেও পারে না যে, লিপিদি কখনো তার ওপর রাগ করতে পারে। আর লিপিও জানে, মুখে অসীম রাগ দেখালেও সত্যি সে কখনো তার ওপর রাগ করে না। ওটা অসীমের স্বভাব।

লিপি তখন বল্লে, "এক কাজ করবি অসীম-ভাই? তোর ময়নাটাকে আমার কাছে এনে রাখবি? দুটি ময়নাই একসঙ্গে থাকবে, বেশ মজা হবে, না রে?"

অসীম আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। "বাঃ, তা হ'লে তো আর কোনো ঝঞ্ঝাটই থাকে না। কালকেই এনে দেব তোমাকে। তুমি কিন্তু তার সব ভারই নেবে। আর কথা বলতেও শেখাবে—দস্যিমেয়ে লিপিদিদি।"

—"আচ্ছা আচ্ছা, শেখাব, দুষ্টু ছেলে [illegible]।

কিন্তু আমি যদি তোর ময়নাটাকে মেরে ফেলি ? আমার যা হিংসে !"

অবিশ্বাসের হাসি হেসে অসীম ব'লে ওঠে, "ধ্যেৎ, তাই বুঝি কখনো পারো ?"

—"কেন ? পারব না কেন ?" লিপি জিজ্ঞাসা করে।

—"বা-রে, তুমি যে আমার লিপিদি।"

পরদিন ভোরবেলাকার কথা। অসীম আজ অনেক আগে থাকতেই উঠেছে। ময়নাকে নিয়ে যাবে আজ লিপির কাছে। সে জানে তার লিপিদি বল্লেই তার ময়না কথা বলবে। লিপির ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। সে ভাবে —বেশ মজা হবে তাহ'লে, নিজে শিখিয়ে নিজেই জব্দ। লিপিদিটা কী বোকা !

অসীম তারপর যায় ময়নাকে আনতে। যে ঘরে তাকে রাখা হয়েছিল সে ঘরের দরজা খুলতেই সে চম্‌কে ওঠে। খাঁচার ভিতর ময়নাটা প'ড়ে আছে চুপ ক'রে। হাতে নিয়ে সে দেখতে পায় ময়নাটা আর বেঁচে নেই। পিঁপড়েতে তাকে ঢেকে ফেলেছে। অমনি তার মনে প'ড়ে যায় লিপিদির কথা। দু'চোখ তার ভ'রে আসে জলে।

বেলা অনেক হয়ে যায়। কিন্তু অসীম আসছে না দেখে লিপি ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তাদের বাড়ি এসে দেখতে পায়—অসীম শুয়ে আছে বিছানায় মুখটি ভার ক'রে।

কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "একি অসীম, শুয়ে আছিস্ কেন ভাই? কি হয়েছে? কই, তুই তো গেলি না ময়না নিয়ে? কি হয়েছে তোর বল্ না?"

—"লিপিদি, আমার ময়নাটা আর নেই, সে ম'রে গেছে।"

অসীমের কথা শুনে চম্‌কে ওঠে লিপি। একি! শেষটা তার কথাই ফ'লে গেল। কিন্তু সে তো ঠাট্টা করেছিল মাত্র। সে তো আর সত্যিই চায়নি যে অসীমের ময়নাটা ম'রে যাক্। আর তাই কি সে চাইতে পারে। অসীম যে তার ছোটভাই। কিন্তু এমন হবে তা কে জানত। লিপির চোখ দুটি ছল্‌ছল্ ক'রে ওঠে। সে অসীমের হাত ধ'রে বলে, "আমাকে তুই ক্ষমা কর্ অসীম-ভাই। আমি কি জানতুম যে-কথা হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে তাই সত্যি হবে। উঃ, কি সাংঘাতিক আমি।"

লিপি আর কথা বল্‌তে পারে না।

অসীম তাকে সান্ত্বনা দিতে যায়,—"একি লিপিদি, তুমি কাঁদছ? ছিঃ কাঁদতে নেই। তুমি বলেছ ব'লেই কি আমার ময়নাটা ম'রে গেল। তাই কি কখনো হয়। ওর আয়ু ছিল না, তাই ম'রে গেল। মা যে তাই বল্লেন।"

বিকেলবেলা অসীম যায় লিপিদের বাড়ি। গিয়ে দেখে লিপির ময়নাটা তো সেখানে নেই। খাঁচাটা প'ড়ে আছে

ঘরের এক কোণে। বিস্মিত হয়ে অসীম জিজ্ঞাসা করে, —"একি লিপিদি, তোমার ময়নাটার কী হোলো? খাঁচাটা এমন ক'রে প'ড়ে কেন?"

একটুখানি হেসে লিপি অসীমের দিকে চেয়ে ব'লে ওঠে, "আমার ময়নাটাও আর নেই ভাই, তাকে ছেড়ে দিয়েছি ওই আকাশে। সে আর ফিরে আসবে না।"

অসীম বিস্মিত হয়ে তাকায় লিপির পানে। লিপি শুধু হাসে।

লালুর কারসাজি

লালু হচ্ছে মুচির ছেলে।

বয়স তার বেশি নয়, এই দশ কি এগারো। কিন্তু এরই মধ্যে সে দিব্যি রোজগার করতে শিখেছে। জুতো মেরামত ক'রতে অবিশ্যি পারে না, কিন্তু বুরুশ করতে ওস্তাদ।

ভোর না হ'তেই কালি আর বুরুশের ছোট্ট ঝোলাটা নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। তারপর চৌরঙ্গীর মোড়ে গিয়ে গান করতে শুরু ক'রে দেয়। সেই গান, যে-গান তোমরা অনেকেই শুনেছ—

"একটি পয়সা দাও গো বাবু,
একটি পয়সা দাও—
ময়লা জুতো সয় না পায়ে,
পালিশ ক'রে নাও।......"

লালুর গলা ভারি মিষ্টি। আর তার ওপর সে ছেলেমানুষ। তাই খদ্দের জুটতেও দেরি হয় না। সে চটপট্ জুতোয় কালি লাগায়, বুরুশ করে, আর গান গায়। ওর গান শোনবার লোভেই অনেকে গিয়ে ভিড় জমায় সেখানে। তারপর নিজেদের জুতোর দিকে যখন নজর পড়ে, তখন লালুকে দিয়ে তারা পালিশ করিয়ে নেয়। অপরিষ্কার জুতো তখন ঝক্‌ঝক্ করে। খদ্দের

খুশি হয়ে ওর প্রাপ্য একটি পয়সার সঙ্গে আরেকটি পয়সা বখশিস্ দিয়ে বসে। খুশি হয়ে লালু মস্ত একটা সেলাম ঠোকে।

কিন্তু কল্‌কাতার মতো জায়গায় দুষ্টু লোকেরও তো অভাব নেই। এই তো দিন কয়েক আগে চশমা-পরা একটি বাবু ওকে দিয়ে জুতো পালিশ করিয়ে নিয়ে স'রে পড়েন, আর ফেরেন না। জুতো পালিশ করবার পর বাবুটি বলেন—"তোর কাছে ভাঙানি পয়সা হবে?" লালু জবাব দেয়—"এই তো বউনির সময় বাবু, এখন ভাঙানি পাব কোত্থেকে!" বাবুটি বলেন—"আমার কাছেও তো দেখছি একটা আধুলি ছাড়া আর কিছুই নেই। আচ্ছা দাঁড়া, ঐ মোড়ের দোকানটা থেকে ভাঙিয়ে এনে দিচ্ছি।" এই ব'লে তিনি সেই যে কেটে পড়লেন আর ফিরলেন না। লালু তখন অন্য এক বাবুর জুতো পালিশ করছিল, তাই। নইলে কি সে-ও ছেড়ে দিত নাকি! বাবুর পেছনে পেছনে সেও যেত দোকানে। যাকৃগে, একটা পয়সা বই ত নয়! এক পয়সা নিয়ে কতো আর বড়লোক হবে!

কিন্তু লালু মনে মনে সেদিন বুঝে উঠ্‌তে পারেনি যে ভদ্রলোকদেরও কেন এমন মনোবৃত্তি হয়! তাও সামান্য একটা পয়সার জন্যে! সেই থেকে লালু কাউকে আর বিশ্বাস করে না। করবে কেমন ক'রে? ভদ্রলোকেরাই যদি এমনি ক'রে ঠকিয়ে স'রে পড়েন, তাহ'লে ছোট-লোকেরাও যে তাই করবে, সে আর বেশি কথা কি!

এই ঘটনার দিন কয়েক পরের কথা। লালুর আর সেদিন খদ্দেরের অন্ত নেই। একজনের পর আরেকজনের

জুতো পালিশ ক'রে যাচ্ছে, আর গান গেয়ে চলেছে তার মিষ্টি মধুর গলায়—

"কালো কালির বুরুশ ভালো,
ঠিক্‌রে যাবে জুতোর আলো,
এক পালিশে যায় বারোমাস,
একটু থেমে যাও।....."

তার গান শুনে অনেককেই থামতে হয়। আর জুতোর দিকে তাকিয়ে বুরুশও করিয়ে নিতে হয় শেষে। একটি বাবু তো ওর গান শুনেই একটি পয়সা দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু লালু তাঁকে থামিয়ে বল্লে—"কই, আপনার জুতো তো পালিশ করিনি বাবু!" বাবু বল্লেন—"না, ওটা আমি তোমাকে ওম্‌নিই দিলুম।" লালু হেসে বল্লে—"তা হয় না বাবু। জুতো পালিশ করিয়ে নিন, তারপর না হয় একটা পয়সা বখশিস্ দেবেন আরো।" বাবু ওর কথায় খুশি হয়ে জুতো পালিশ করিয়ে নেন। আর যাবার সময় ছুটো পয়সা বখশিস্ দিয়ে যান। লালু ভাবে,—এমন লোকও তবে আছে!

লালুর খদ্দের তখন ক'মে এসেছে। এমন সময় সে দেখতে পেলে, পয়সা না দিয়ে পালিয়ে যাওয়া সেই বাবুটি আসছেন ওদিক থেকে। কাছে আসতেই লালু ব'লে উঠল—"বাবু, পালিশ!" বাবুটি দেখতে পেলেন—'লালু'। সেদিনের কথা তাঁর মনে প'ড়ে গেল। কিছু না ব'লে তাই তিনি হাঁটতে শুরু করলেন।

লালুর মাথায় এক ফন্দী খেলে গেল। সে ভাবলে, যদি আমি সেদিনকার পয়সার কথা তুলে পয়সা চাই

তাহ'লে তো নিশ্চয়ই পয়সা পাব না। কেননা, সাক্ষী কোথায়? মুচির ছেলের কথা কে বিশ্বাস করবে? তার চেয়ে বরঞ্চ আর এক কাজ করা যাক। এই ভেবে লালু সেই বাবুটির সঙ্গ নিলে।

"বাবু, একবারটি পালিশ করিয়ে নিন, দেখবেন জুতো কেমন ঝক্‌মক্‌ করে। পয়সার জন্যে ভাবনা কি, আপনি তো আর পালিয়ে যাচ্ছেন না! আজ না থাকে আরেক-দিন দেবেন। আসুন।" এই ব'লে লালু বাবুটির মুখের দিকে তাকায়।

বাবুটি ভাবলেন, মন্দ কি! পালিশটা করিয়ে নিই তো, তারপর পয়সা! একবার স'রে পড়লে, কে আর ধরে! সেদিনও ব্যাটা ঠকেছে, আজও ঠকবে। এই ভেবে লালুকে তিনি বলেন—"নে, পালিশ কর্‌, যদি ভালো হয় পালিশ, কাল তোকে চারটে পয়সা দিয়ে যাব।" লালু বলে— "এইখানে পা-টা রাখুন।" এই ব'লে সে তার ছোট কাঠের বাক্সটা দেখিয়ে দেয়। বাবু তাতে পা রাখেন, লালু পালিশ করে। সেটা পালিশ হয়ে গেলে বাবু তাঁর জুতোসুদ্ধ বাঁ-পাটা বাক্সের ওপর তুলে ধরেন। "নে, এটা পালিশ কর্‌।"—লালুর দিকে চেয়ে বাবু বলেন।

ঘাড় নেড়ে লালু জবাব দেয়—"না বাবু, একটাই থাক্‌। আগে সেদিনকার পয়সাটা ফেলুন, তারপর ওটা হবে।" এই ব'লে সে তার জিনিসপত্তর গোছাতে শুরু করে।

লালুর কথা শুনে বাবু তো অবাক! ছোঁড়াটা বলে কি! আচ্ছা চালাক তো! আরেক-পাটি জুতো পালিশ

না করালে যা বিচ্ছিরি দেখাবে। এক পায়ের জুতো ঝক্‌ঝকে, আর, আরেক পায়ের জুতো কাদামাটি মাখানো! লোক বলবে কি। ছোঁড়াটা তো আচ্ছা চাল চেলেছে। এখন সেখান থেকে চ'লে যেতেও পারেন না, অথচ দু'দিনকার পয়সাই দিতে হবে। মহামুস্কিল। তাছাড়া বাবুটির ওই অবস্থা দেখে পাশের চানাচুরওয়ালাটাও হাসতে শুরু করেছে। বেশি দেরি করলে ছোঁড়াটা হয়তো লোক-জনও জোটাতে পারে। ছি, ছি, সে কি লজ্জার কথা! কাজ নেই বাপু অত হাঙ্গামা ক'রে, তার চেয়ে ওকে পয়সাদুটো দিয়ে দেওয়াই ভালো। এই ভেবে বাবুটি তখন লালুকে দুটো পয়সাই দিয়ে বল্লেন—"নে বাপু; খুব আক্কেল হয়েছে, তাড়াতাড়ি এখন এটা পালিশ ক'রে দে।"

পয়সা পেয়ে লালু তখন বাকি জুতোটা পালিশ ক'রে দেয়। আর যাবার সময় বাবুর দিকে চেয়ে ব'লে ওঠে—"মনে রাখবেন বাবু, কাউকে ঠকালে নিজেকেই শেষটায় ঠকতে হয়।" লালুর কথা শুনে চানাচুরওয়ালা হাসে; বাবুটি লজ্জায় ম'রে যান।

বন্ধুর বন্ধুত্ব

উলিপুর হাইস্কুলের ফোর্থ ক্লাসে সেদিন বেশ একটা হৈ চৈ প'ড়ে গিয়েছিল। ক্লাসে একটি নতুন ছেলে এসেছে, তাই নিয়ে এত কাণ্ড।

সামনের বেঞ্চের মণ্টু নন্দকে বল্লে—'দেখেছিস্ ভাই ছেলেটার চেহারাখানা একবার। যেন আফ্রিকা থেকে এসেছে। কাফ্রিদের মতো গায়ের রঙ। আহা কি রূপের ছিরি। দেখলে বমি আসে।' তাকে বাধা দিয়ে নন্দ ব'লে ওঠে—'শুধু কি তাই। বয়েসটা দেখেছিস্ একবার। যেন আমার বড়দাদা। এত বড় ধিঙ্গী ছেলে, কিনা ফোর্থ ক্লাসে পড়ে।'

নতুন ছেলেটির নাম সুধীর। গরীবের ছেলে সে। অর্থের অভাবে ভালোভাবে পড়বার সুযোগ সে পায়নি। তাই বয়েসটা তার ফোর্থ ক্লাসের অনুপযোগীই হয়েছে। গায়ের রঙটাও বেশ কালোই। তার ওপর চেহারাটাও সুশ্রী নয়। তাই গুটিকয়েক ছেলে তাকে উপলক্ষ্য ক'রে বেশ একটু ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করেছিল। কিন্তু এমন সময় হঠাৎ ক্লাসে এসে ঢুকলেন ভূগোলের মাস্টার জগদানন্দবাবু। অমনি সব চুপচাপ।

জগদানন্দবাবু বেজায় কড়া লোক। পড়া বলতে না পারলে তিনি ভয়ঙ্কর চ'টে যান। তার ওপর যদি কেউ দুষ্টুমি করে তাহ'লে তার আর রক্ষে নেই। হয় নীলডাউন

ক'রে দেখেন, নয়তো এক পায়ে দেবেন—দাঁড় করিয়ে, আর না হয়তো ক'সে মারবেন বেত। তাই শাস্তির ভয়ে অন্তত তাঁর পিরিয়ডের পড়াটা সবাই তৈরী করত।

জগদানন্দবাবুর মেজাজটা সেদিন বোধ হয় শান্তই ছিল। তাই ক্লাসে এসে তিনি বল্লেন—'দেখ, আজকে তোমাদের আমি পড়াবো না। জানো তো ইউরোপে কি ভীষণ যুদ্ধ বেধেছে—আজকে সেই সম্বন্ধেই কিছু বলব—মন দিয়ে শোনো। কালকে কিন্তু জিজ্ঞেস করব—তখন যদি না পারো তাহ'লে টের পাবে মজাটা!'

এই ব'লে জগদানন্দবাবু ইউরোপের যুদ্ধ সম্বন্ধে বক্তৃতা শুরু করেন। ছেলেরা সব মন দিয়েই শুনছিল, হঠাৎ তিনি প্রশ্ন ক'রে বসলেন, 'ওহে বলতে পারো কোন্ দেশকে ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্র বলা হয়?'

ছেলেরা কিন্তু ভাবতে পারেনি যে, জগদানন্দবাবু এমন কোনো প্রশ্ন ক'রে বসবেন যা তাদের বইয়ের মধ্যে নেই। তাই তারা চুপ ক'রে বসে রইল, কেউ কোনো জবাব দিলে না। এমন সময়, মণ্টুর পেছন থেকে একটি ছেলে হঠাৎ ব'লে উঠল, 'আজ্ঞে, কুরুক্ষেত্র স্যার!' অম্‌নি সবাই হেসে উঠল হো হো ক'রে। যে জগদানন্দবাবু ক্লাসে কখনো হাসেন না তিনিও হাসি চাপতে পারলেন না।

'বাঃ বেশ উত্তর দিয়েছ তো নিধিরাম! খাসা ছেলে! তোমার বাবাকে ব'লো তোমার মাথাটা তেলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে—বুদ্ধিটা বেশ পেকে উঠবে। বুঝলে?' এই ব'লে জগদানন্দবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কেউ

বলতে পারো—ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্র বলতে কোন্ দেশটাকে বোঝায় ?'

পেছনের বেঞ্চে শঙ্করের পাশে ব'সে ছিল সেই নতুন ছেলেটি—ভূপেন। ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বল্লে, 'আজ্ঞে, বেলজিয়াম।'

খুশি হয়ে জগদানন্দবাবু বল্লেন 'Good !'

নন্দ এবার ফিস্ ফিস্ ক'রে মন্টুকে বল্লে—'ছেলেটা পড়াশোনায় বোধ করি ভালোই হবে, কি বলিস্ মন্টু ?' মন্টু জবাব দেয়, 'ইস্, ভারি তো একটা উত্তর দিতে পেরেছে তাহ'লেই হোলো আর কি। আচ্ছা, দেখা যাবে'খন গিরিশবাবুর ক্লাসে—কেমন এ্যালজাব্রা কষ্‌তে পারে !'

এমন সময় ঢং ঢং ক'রে টিফিনের ঘণ্টা বেজে উঠল। ছেলেরা সব হৈ হৈ করতে করতে ক্লাস থেকে গেল বেরিয়ে। শুধু ব'সে রইল—ভূপেন, শঙ্কর আর নন্দ।

ভূপেনের কাছে এসে নন্দ জিজ্ঞাসা করল—'তুমি এখানে কোথায় থাক ভাই ?'

'ঐ যে নদীর ধারে পরেশবাবুর বাসা—আমি ভাই ওইখানেই থাকি। তিনিই আমায় দয়া ক'রে তাঁর ওখানে আশ্রয় দিয়েছেন। খুব স্নেহ করেন আমাকে।'

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করল—'বাড়িতে তোমার আর কে কে আছেন ভূপেন ?'

'বাড়িতে তো আমার কেউই নেই ভাই। আছেন এক বুড়ো কাকা—তিনিই আমায় মানুষ ক'রে তুলেছেন

সেই ছোটবেলা থেকে—যখন আমার বাবা আর মা দুজনেই মারা যান। আর আমার কেউই নেই। তবকপুর মাইনর-স্কুল থেকে পাশ ক'রে এখানে এসেছি আরো পড়ব এই আশা ক'রে। কিন্তু, আমি ভাই গরীব। এমন পয়সাকড়ি নেই যে বইপত্র কিনে পড়াশোনা করি। তাছাড়া নতুন এসেছি—কাউকেই চিনি না যে, তাদের কারো কাছ থেকে বই জোগাড় ক'রে নেব। তোমরা যদি দয়া ক'রে খানকতক বই আমায় জোগাড় ক'রে দাও—'

ভূপেনের কথাবার্তায় নন্দ বেশ বুঝতে পারলে, ছেলেটির পড়াশোনায় রীতিমতো উৎসাহ আছে, শুধু গরীব ব'লেই বইয়ের অভাবে ভালো ক'রে পড়াশোনা করতে পারে না। তাই তার মনটা খুব গ'লে গেল। প্রকাশ্যে বল্লে, 'আচ্ছা ভাই, তোমার কি কোনো বই-ই নেই?'

'ইতিহাস আর ইংরেজী গ্রামারখানা জোগাড় করেছি, আর বাংলার মাস্টার বিভূতিবাবু আমাকে একখানা বাংলা বই দিয়েছেন। আর তো কোনো বই-ই পাইনি ভাই!'

শঙ্কর সে কথা শুনে বল্লে—'তুমি ভেবো না ভাই, তোমার সমস্ত বই জোগাড় ক'রে দেবার ভার নিলুম আমি আর নন্দ। আজ থেকে তুমি আমাদের বন্ধু—কেমন?'

ঘাড় নেড়ে ভূপেন জবাব দেয়—'তোমরাই তো আমার আপনার জন ভাই। এখন থেকে তোমরাই আমার সব।' দু'টি ছেলের এই অযাচিত ও অকৃত্রিম

ভালোবাসায় গরীব ভূপেনের মন খুশিতে ভরপুর হয়ে উঠল ; হু'চোখ তার ভ'রে গেল আনন্দের অশ্রুতে।

মণ্টু কিন্তু ভূপেনকে দেখতে পারত না মোটেই। তার প্রধান আক্রোশ ছিল—ভূপেন ক্রমশই ছেলেদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠছে। আর ক্লাসের পড়াশোনাতেও ধীরে ধীরে সে ফার্স্টবয় মণ্টুকে ছাড়িয়ে চলতে আরম্ভ করেছে। সেইজন্যেই তো মণ্টুর অত ভয়! পাছে সে পরীক্ষায় ফার্স্ট হ'তে না পারে।

মণ্টু কিন্তু ছেলে খুব ভালো। মানে, প্রত্যেক পরীক্ষায় বরাবরই সে-ই ফার্স্ট হয়। আবার খেলাধুলোতেও চমৎকার। তাই ক্লাসের সব্বাই মণ্টুকে খুব মেনে চলে। কিন্তু ভূপেন আসার পর থেকে সবাই যেন তাকেই বেশি ভালোবাসতে শুরু করেছে—তাই মাঝে মাঝে মণ্টুর হয় হিংসে। ভাবে, কি ক'রে ওকে জব্দ করা যায়।

মণ্টুর একটা দল ছিল। তা'তে ছিল বিমান, হারাধন, ফেলু, বিশু। তারা সবাই মণ্টুর কথায় উঠত বসত। পড়াশোনাতে তারাও নেহাৎ মন্দ ছিল না। কিন্তু মন তাদের কারুরই খুব সরল নয়। ভূপেন আসার পর থেকে মণ্টুও যেন কেমনধারা হয়ে যাচ্ছে। কেউ কিছু বল্লেই সে চ'টে ওঠে। আর, কেউ যদি তার সামনে ভূপেনের প্রশংসা করে তাহ'লে আর রক্ষে নেই। হয়তো তাকে মেরেই বসবে।

দিন কয়েক পরে ক্লাসে কে এসে বল্লে—'ভূপেন আজ ইস্কুলে আসেনি। কাল সন্ধ্যেবেলা কারা যেন তাকে

ঢিল ছুঁড়ে মেরেছে, তা'তে তার কপালটা গেছে কেটে। আর তার ওপর জ্বরও হয়েছে খুব।'

শঙ্কর নন্দকে বল্লে—'আমি তো ভাই কিছুতেই বুঝতে পারছি না কে ভূপেনকে মারলে।'

নন্দ বল্লে—'আমিও না।'

এমন সময় মাধু এসে বল্লে—'দেখ ভাই, তোমরা যদি কাউকে না বল, তাহ'লে আমি বলতে পারি কে মেরেছে ভূপেনকে।'

উৎকণ্ঠিত হয়ে নন্দ জবাব দিলে—'আমরা কাউকে বলব না ভাই, বলনা কে মেরেছে?'

—'তোমাদের ঐ মণ্টু, বিমান, ওরা।'

—'যাঃ তাও কি কখনো হ'তে পারে। মণ্টুর অমন স্বভাব নয়।'

—'নয় সত্যি। কিন্তু এখন ও অমনধারাই হয়েছে। ভূপেনকে ও তু'চক্ষে দেখতে পারে না। কাল যখন বাজার থেকে ফিরছিলাম তখন আমি স্বচক্ষে দেখেছি। মণ্টু আমায় সাবধান ক'রে দিয়েছে যে, আমি যদি একথা কাউকে বলি তাহ'লে আমাকে আর আস্ত রাখবে না। দোহাই ভাই, তোমরা যেন কাউকে একথা আর ব'লো না।'

সপ্তাহখানেক পরের কথা।

নদীর ঘাটে একদল ছেলে স্নান করছিল আর সাঁতার

কাটছিল। হঠাৎ কে যেন চীৎকার ক'রে উঠল—'গেল গেল, ডুবে গেল, ডুবে গেল !!'

ভুপেনও সেদিন স্নান করতে গিয়েছিল নদীতে। চীৎকার শুনে সে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে, সাঁতার

দিতে গিয়ে মন্টু চ'লে গেছে অনেক দূরে—প্রায় মাঝ-নদীতে। ফিরতে গিয়েও ফিরতে পারছে না—জলে ডুবতে আরম্ভ করেছে।

তৎক্ষণাৎ ছুটে চল্ল ভূপেন সাঁতার কেটে। গিয়েই মণ্টুকে ও ধরে ফেল্লে। আর মিনিট-দুই দেরি হ'লেই হয়েছিল আর কি। মণ্টুকে পিঠে ক'রে ফিরে এল ভূপেন।—মণ্টু তখন প্রায় অজ্ঞান অচৈতন্য।

জ্ঞান হবার পর মণ্টু দেখতে পেলে—সে শুয়ে আছে তার নিজের ঘরে। মাথার কাছে ব'সে আছেন তার মা।—আর পাশের একটা বেঞ্চিতে ব'সে আছে—ভূপেন, নন্দ আর শঙ্কর।

মণ্টুর আজ মনে পড়ল ভূপেনের কথা। হিংসার বশবর্তী হয়ে একদিন সে যাকে ঢিল ছুঁড়ে মেরেছিল—সে-ই আজ তাকে নিশ্চিত মরণের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। সে কি তার শত্রু? সে যে তার পরম বন্ধু। লজ্জায় মণ্টুর মুখ রাঙা হয়ে উঠল। ইশারায় সে ডাকলে—ভূপেনকে।

ভূপেন কাছে আসতেই সে তার হাত ধ'রে কেঁদে ফেল্লে।—তারপর ব'লে উঠ্‌ল—'আমাকে ক্ষমা করো ভাই। সেদিন হিংসায় অন্ধ হয়ে তোমাকে মেরেছিলাম আমি। আর আজ তুমি আমাকে বাঁচিয়ে সেই শত্রুতার যোগ্য প্রতিশোধ নিয়েছ। তুমিই ফার্স্টবয় হবার যোগ্য। আমার অপরাধ ক্ষমা ক'রে তুমি আমায় তোমার বন্ধু ক'রে নাও ভাই।

মা ও ছেলে

পাহাড়ের নিচে ছোট্ট একটি গ্রাম, তার নাম চম্পাগড়। লোকজন বড় বেশি নেই সেখানে। চা-বাগানের কুলিদের গোটা কয়েক বস্তি; বড়বাবু, ছোটবাবু আর ডাক্তারবাবুর তিনখানি বাংলো ধরণের বাড়ি। তা ছাড়া, একটি পাঠ-শালা, চালডালের ছোট একটি দোকান, আর আটচালা এক ডাকঘরও আছে সেখানে।

কলকাতার কোনো এক মেসে থেকে আমি মাস্টারি করি। আপনার বলতে কেউই আমার নেই। আমি যখন বছর তিনেকের সেই সময় আমার মা যান মারা। তারপর দু'বছর যেতে না যেতেই বাবাও চিরদিনের মতই আমাকে ছেড়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। কাজেই পাঁচ বছরের বালক আমি—অসহায়ই বলতে হবে। কিন্তু অসহায়-আমাকে আদর ক'রে বুকে টেনে নেন আমারই এক মাসীমা। সেই থেকে তাঁর কাছেই আমি মানুষ। তিনি থাকতেন সেই চম্পাগড়ে যার কথা একটু আগেই আমি বলেছি। এবার গরমের ছুটিটা তাঁর ওখানে গিয়ে কাটিয়ে আসতে হবে এই আদেশ ক'রে তিনি আমায় চিঠি লিখে-ছিলেন। তাই ছুটি হ'তেই ছুটলাম সেই মাসীর কাছে। আমার মেসোমশাই সেখানকার চা-বাগানের ডাক্তার।

মাসীমা বলছিলেন—"এলি তো বাছা আজ তিন বছর পরে। কোথায় তোকে এটা-সেটা ক'রে খাওয়াব

—তা ছাই ভালোমন্দ কিছু পাবারই জো নেই এখানে। দেখছিস্ তো কেমন কাঠখোট্টার দেশ।"

আমি হেসে জবাব দিলাম—"তা তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন মাসীমা? ভালোমন্দ কি সারা বছর আর খাই না, কিন্তু মাসীর আদর রোজ কি আমার জোটে? সেইজন্যেই তো ছু'টে এলাম তোমার কাছে। অমন করবে তো আজই চ'লে যাব এখান থেকে।"

আমার পিঠে ছোট্ট একটি চাপড় মেরে মাসীমা বল্লেন —"পাগল ছেলে আমার! যাব বল্লেই হোলো কিনা! ছুটি যদ্দিন না ফুরুচ্ছে, তদ্দিন নড় দেখি এক পা।"

আমাদের কথাবার্তার মধ্যেই মেসোমশাই এসে হাজির। হাতে তাঁর প্রকাণ্ড এক মাছ। চেয়ে দেখি, ঘেমে তিনি একেবারে নেয়ে উঠেছেন। পেছনে এলো বাড়ির ছোকরা-চাকর ভজুরাম। তার হাতে এক বাল্‌তি দুধ। ব্যাপার দেখেই বুঝতে পারলাম আমার জন্যেই এতো কাণ্ড! দুপুর রোদে পাঁচ মাইল পথ হেঁটে মেসোমশাই গিয়েছিলেন আমার জন্যে বাজার করতে। সঙ্গে গিয়েছিল ঐ ছোকরা-চাকর ভজুরাম। সূর্যের তাপে বেচারার মুখ-চোখ একেবারে লাল হয়ে উঠেছে। কে যেন তার সারা মুখ ভ'রে আবীর দিয়েছে মাখিয়ে। ভারি কষ্ট হোলো ওর দিকে চেয়ে।

বলতে ভুলে গেছি, মাসীমার কোনো ছেলেপুলে নেই। মেয়ে একটি হয়েছিল, কিন্তু বছর দু'য়েকের হ'তে না হ'তে সেও মারা যায়। তারপর থেকে পরের ছেলে

মানুষ ক'রেই জীবন তাঁর কাটে। আমি বড় হয়ে যাবার পর অনেক দিন তাঁকে একা একাই কাটাতে হয়েছে। তারপর পেয়েছেন আমারই মতো মা-বাপ-হারা এই ভজুরামকে। তাকে তিনি নিজের ছেলের মতই মানুষ ক'রে তুলছেন। কখনো তাকে চাকর ব'লে মনে করেন না। আদর করেন, ভালোবাসেন, আবার শাসনও করেন। ভজুরামও তাঁকে মা ব'লেই ডাকে,' মায়ের মতই শ্রদ্ধা ভক্তি করে, আবার ছেলের মতই আব্দার করতে লজ্জা পায় না। এই ভজুরামকে নিয়েই আমার গল্প।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে সে চা-বাগান দেখায়। কত গল্প করে। কে কবে গাছে উঠতে গিয়ে পা পিছলে প'ড়ে যায়, কা'র বাপ কোন্ পাহাড়ীর সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে ভোজালীর ঘা খেয়ে মারা যায়—এই রকম আরো কতো কি। ভারি ভালো লাগতো ওর মুখে বাঙ্‌লা কথা শুনতে। বাঙ্‌লা দেশে জন্ম নিয়ে ও যেন একেবারেই বাঙালী ব'নে গেছে।

অসীম সাহস এই ভজুরামের। বয়স ওর অল্প হ'লে কি হয়, গায়ে ওর অসীম শক্তি। টানাটানা সুন্দর দুটি চোখ। কোঁকড়া চুলগুলো কালো মিশমিশ করছে। তীর ছুড়তে ওস্তাদ। যেখানেই যাক্ না কেন, ধনুক একখানা থাকবেই ওর পিঠে।

শহুরে লোক ব'লে বেলা আটটার আগে কোনদিনই

আমার ঘুম ভাঙে না। সেদিন কিন্তু কিসের হট্টগোলে অনেক আগেই ঘুমটা গেল ভেঙে। শুনতে পেলাম মাসীমা যেন বকছেন কাঁকে। বাইরে এসে দেখি ভজুরামের কানের পাশ দিয়ে রক্ত পড়ছে দরদর ক'রে। মাসীমা তাতে জল দিচ্ছেন আর ব'কে চলেছেন অনর্গল।

"কতবার তোকে বারণ করেছি হতভাগা যাস্‌নে ওদিক দিয়ে। শুনবিনি তো কথা—বোঝ এখন। তোর আর কি, দায় তো আমারই। ফের যদি যাস্ ওদিক পানে, মেরে তোর হাড় গুঁড়ো ক'রে দেব—হ্যাঁ।"

এত বকুনি সত্ত্বেও ভজুরামের মুখে হাসিটি লেগেই আছে। মৃদু হেসে সে জবাব দিলে—"বা-রে। আমি কী করব। পথ চলতে হোঁচট্ খেয়ে যদি প'ড়ে যাই সেও কি আমারই দোষ। কতবার তো গিয়েছি মনসা-তলার ধার দিয়ে, কই কখনো হয়েছে কিছু? আর কিই বা এমন কাট্‌ল যার জন্যে ভোরবেলা খামোখা এমন বকুনি দিচ্ছ, বল তো।"

তার কথা শুনে মাসীমা এবার হেসে ফেললেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখতে পেয়েই ব'লে উঠলেন—"শুনলি, ছোঁড়ার কথাটা একবার শুনলি। কেটে গিয়ে একেবারে রক্তগঙ্গা, আর বলে কিনা কতটুকুই বা কেটেছে। আচ্ছা দস্যি ছেলে বাপু।"

"মায়েরই তো ছেলে।" ভজু হাসিমুখে আস্তে ক'রে ব'লে উঠল।

কথা শুনে আমি তো অবাক। মাসীমা শুনেও কিছু বল্লেন না। মৃদু হেসে তার ক্ষত জায়গায় শুধু ওষুধ লাগিয়ে দিলেন। বুঝলাম কতো স্নেহ করেন মাসীমা

এই অনাথ বালকটিকে। মায়ের অন্তরটা যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমার চোখের সামনে। সেখানে আপন-

পুত্র বলে কোনো কিছুই নেই। আছে শুধু [illegible] [illegible]ভালোবাসা। সন্তানের জন্তে অসীম গভীর ব্যথা, করুণার অবিরল উৎস।

আরেক দিনের কথা। দুপুরবেলা বারেন্দায় ব'সে কী একখানা কাগজ পড়ছি। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে দুটি লোক এসে হাজির। পাহাড়ী ভাষায় কী যে বল্লে কিছুই ছাই বুঝতে পারলাম না। তখন ডাক দিলাম মাসীমাকে। তিনি ঘুমুচ্ছিলেন—উঠে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি রে, কি হয়েছে?"

আমি কথা কইবার আগেই পাহাড়ী দুটো মাসীমাকে সব জানাল। তিনি তাদের কথা শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন—"সর্বনাশ হয়েছে রবি, সর্বনাশ হয়েছে। শীগ্গির ছুটে যা আপিসে একবার। তোর মেসোমশাইকে ব্যাগটা নিয়ে চ'লে আসতে বলবি এক্ষুনি। কুলিদের বস্তিতে আগুন লেগেছে। ভজু সেখানে নন্দ-সিংএর ছেলেটাকে বাঁচাতে গিয়ে আগুনের হল্‌কা লেগে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। কুলিরা সব মাঠে। কি যে হবে কে জানে। যা যা, শীগ্গির ছুটে যা।"

আগুন লাগার খবর পেয়ে কুলিদের ছুটি দেওয়া হয়েছিল। তারা এসে কোনোরকমে আগুনটা নিভিয়ে ফেলে। ওদিকে আমি আর মেসোমশাই ভজুরামকে নিয়ে এলাম

বাড়িতে। সে তখনও অচৈতন্য। জ্ঞান হ'লে পর সমস্ত ব্যাপারটা সে খুলে বল্ল। "আগুন দেখতে পেয়ে ভজু ছুটে যায় বস্তিতে। সেখানে তখন দু'একজন লোক ছাড়া আর কেউ ছিল না। সবাই ছিল মাঠে। একটি মেয়ে চীৎকার করছিল—তার বাচ্চা রয়েছে ঘরে, তাকে সে আনতে পারছে না। এই শুনে ভজু কোনো দিকে না তাকিয়েই ছুটে যায় ঘরের ভিতর, কোলে ক'রে বাইরে নিয়ে আসে ছেলেটিকে। কিন্তু আগুনের হল্‌কা লেগে সে অজ্ঞান [illegible]

হপ্তাখানেক চিকিৎসার পর ভজু অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু তার বাঁ চোখটি গেল চিরদিনের মতো নষ্ট হয়ে। সেজন্যে তার বড় একটা দুঃখ নেই। মাসীমা জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয়—"কষ্ট কি মা! একটা গেছে আরেকটা তো আছে, ঐটে দিয়েই কাজ চালিয়ে নেব। কিন্তু সেদিন আমি যদি না থাকতাম, তাহ'লে নন্দ-সিংএর ছেলেটা কি আর বাঁচত। ও যে মায়ের এক ছেলে।" শুনে আমার চোখ দিয়েও দু'ফোঁটা অশ্রু পড়ল গড়িয়ে। মনে হোলো কত মহৎ কত উদার এই বালক।

ক্রমশ আমার ছুটি এলো ফুরিয়ে। কলকাতায় ফেরবার দিনও গেল ঠিক হয়ে। ভজুকে কাছে ডেকে

জিজ্ঞাসা করলাম—"আমার সঙ্গে যাবি তুই কলকাতা? সেখানে তোর চোখ ভালো হয়ে যাবে। তোর বাবু তো আমার সঙ্গেই তোকে পাঠাতে চাইছেন।"

চোখ ভালো হয়ে যাবে শুনে ভজু অবাক হয়ে গেল। আগ্রহের সঙ্গেই সে ব'লে উঠল—"সত্যি বলছো দাদা-মণি? চোখ আমার ভালো হয়ে যাবে? সত্যি বলছো?"

"বিশ্বাস না হয়, তোর মাকেই জিজ্ঞেস্ কর্।"—আমি বল্লাম।

শুনে দৌড়ে গেল সে মাসীমার কাছে রান্নাঘরে। সেখান থেকে আশ্বাস পেয়ে আমার কাছে ফিরে এলো। তারপর আগ্রহের সঙ্গেই ব'লে উঠল—"আমায় তুমি নিয়ে যাবে দাদামণি? ঈস্, কি মজাই হবে তাহ'লে। তখন কেউ আর কাণা বলতে পারবে না আমায়। আমার চোখ ভালো হয়ে যাবে, আমি আবার দেখতে পাব আগের মতই—সত্যি বলছো তোমরা?"

হেসে জবাব দিলাম—"হ্যাঁ রে হ্যাঁ, সত্যি বলছি।"

কলকাতায় যেতে পাবে, চোখ আবার ভালো হয়ে যাবে, এই আশায় ভজুরাম তখন থেকেই মেতে উঠল। যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই একবার ক'রে কথাটা জানিয়ে দেয়। ক্রমে সারা চম্পাগড়ে রাষ্ট্র হয়ে গেল—ভজু কলকাতায় চলেছে। চা-বাগানের কুলিরা সবাই তাকে ভালোবাসত, তাই যাবার দিন ছেলে বুড়ো মেয়ে দলে দলে একবার ক'রে এসে ভজুকে দেখে যেতে লাগল।

-বড়বাবুর [illegible] এলো [illegible] বাড়ির সামনে। মেসোমশাই সেই মোটরেই আমায় স্টেশনে পৌঁছুবার বন্দোবস্ত করেছেন।

যাত্রার উদ্যোগ করছি এমন সময় চোখ দুটি জলে ভিজিয়ে ভজু এসে জানাল—"না দাদামণি, আমি আর যাব না। তুমি একাই যাও।"

কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। আর যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারাও কম বিস্মিত হোলো না। দু'দিন থেকে যাবার নেশায় যে বাক্স-বিছানা গুছিয়ে রেখেছে—সবাইকে ব'লে বেড়িয়েছে—হঠাৎ এমন কী হোলো যার জন্যে সে আর যেতে চাইছে না।

"কেন রে, যাবি না কেন? হঠাৎ কী হোলো? চল্ চল্, দেরি করিস্‌নি। অনেকটা পথ যেতে হবে। সময় আর বেশি নেই।"—আমি বল্লাম।

চোখ দু'টি ছলোছল ক'রে সে শুধু জবাব দিলে—"না দাদামণি, আমি যাব না।"

"সেখানে না গেলে তোর চোখ ভালো হবে কেমন ক'রে?"

"কাজ নেই আমার চোখ ভালো হয়ে। মা'কে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না। আমি চ'লে গেলে মা থাকবে কেমন ক'রে? এটাও কি তোমরা বোঝ না দাদামণি?"

বেশি আর সে কাঁদতে পারল না। ছুটে গেল মাসীমার কাছে। তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে ব'লে উঠল—"আমি তোমার সঙ্গে যাব, না মা ?"

দু'চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা নামিয়ে মাসীমাও কাতর কণ্ঠে জবাব দিলেন—"হ্যাঁ বাবা, তুমি আমার সঙ্গেই যাবে।"

বীর বালক

ছুটির পর স্কুলের মাঠে বয়-স্কাউটরা এসে জড়ো হয়েছে। তাদের মধ্যে কথা হচ্ছিল নিরঞ্জনবাবুকে নিয়ে। তিনি স্কুলের স্কাউট-মাস্টার। তাঁরই যত্নে আর উৎসাহে শ্যামপুর স্কুলের এই অভাবটি এতদিনে পূর্ণ হয়েছে। তাঁকে পেয়ে ছেলের দল আনন্দে মেতে উঠেছে। সবাই তাঁর কথা বলতে পঞ্চমুখ।

পটলা বলে—"সত্যি ভাই, নিরঞ্জনবাবু আসাতে আমাদের ইস্কুলের চেহারাটাই যেন বদ্‌লে গেছে। না রে সতু?"

সতু উত্তর দেয়—"হ্যাঁ ভাই, সত্যি বদ্‌লে গেছে। আগে তো আমরা মোটে খেলতেই পেতুম না, এখন দেখেছিস্ কতরকম খেলতে পাচ্ছি। তার ওপর স্কাউটিং। আঃ কী আনন্দই হয় যখন আমরা মার্চ ক'রে চ'লে যাই,—সবাই আমাদের চেয়ে দেখে একদৃষ্টিতে,—মনে হয় যেন বিশ্ববিজয় করতে চলেছি!"

বিশু এতক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে ছিল গোল-পোস্ট্‌টায় হেলান দিয়ে। এইবার সে ব'লে ওঠে—"যা বলেছিস্ ভাই, সত্যি, স্কাউটের ঐ পোশাক পরলেই যেন আমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে, মনে হয় যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যেন যুদ্ধ করছি!"

তাদের এই কথাবার্তার মাঝখানেই নিরঞ্জনবা এসে

পড়েন সেখানে। তাদের সঙ্গে তিনিও ব'সে পড়েন ঘাসের উপর। তারপর ছেলেদের কাছে ডেকে নিয়ে তিনি বলেন—"আজকে আর তোমাদের স্কাউটিং হবে না, আজ তোমাদের ছুটি।"

ছেলেদের মধ্যে যেন একটু চঞ্চলতা দেখা যায়। অবনী জিজ্ঞাসা করে—"আপনার কি কোনো অসুখ-বিসুখ করেছে স্যার?"

"না না, অসুখ-বিসুখ করবে কেন? তোমরা ভেবেছ সেইজন্যেই বুঝি ছুটি দিচ্ছি। না না, সেজন্যে নয়। কেন ছুটি দিচ্ছি জান? একটানা কাজকর্মের মধ্যে ছুটিরও প্রয়োজন হয় ব'লে—বুঝলে?"

"ও, তাই বলুন স্যার।·· কিন্তু আমরা ছুটি পেলেও আপনাকে ছুটি দিচ্ছি না,—আপনাকে আজ একটা গল্প বলতে হবে স্যার—কোনো আপত্তিই শুনব না···।"

সবাই তখন নিরঞ্জনবাবুকে ঘিরে বসে গল্প শোনবার জন্যে। নিরঞ্জনবাবু বলতে শুরু করেন—"আচ্ছা, আমার জীবনেরই একটা ঘটনা বলছি শোন। তখন আমি বোর্ডিংএ থেকে স্কুলে পড়ি। বয়স তখন বছর বারো। আমাদের গ্রামে কোনো স্কুল ছিল না,—পড়তে হ'ত, মহকুমার স্কুলে। আমাদের গ্রাম থেকে মহকুমা প্রায় মাইল পঞ্চাশেক দূর হবে, মাঝে একটা নদী। একবার ছুটির সময় যখন বাড়ি ফিরি তখন ভয়ঙ্কর একটা দুর্যোগের মধ্যে পড়েছিলুম ঐ নদীতে।"

"কী হয়েছিল স্যার, কী হয়েছিল?"

"আঃ চুপ কর্ না গোবিন্দ, স্যার তো বলছেনই, অমন বাজে বকছিস্ কেন ?···বলুন স্যার, আপনি বলুন।"

নিরঞ্জনবাবু আবার শুরু করেন—"হ্যাঁ, আমি তখন

পার হচ্ছিলুম নৌকোয় ক'রে, এমন সময় সমস্ত আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে এল, তারপর উঠল ঝড়। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও শুরু হোলো তুমুল বেগে। মাঝিরা কিছুতেই নৌকো

সামলাতে পারল না, জোর বাতাস লেগে মাঝনদীতে নৌকো গেল উল্টে।"

ছেলেরা সব আঁৎকে উঠল নিরঞ্জনবাবুর এই কথা শুনে। অজয় তখন ব'লে উঠল—"সর্বনাশ! আপনি বাঁচলেন কেমন ক'রে? আপনার সঙ্গে কেউ ছিল না স্যার?"

"না অজয়, আমি তখন একাই যাওয়া-আসা করতে পারতুম। কিছুতেই আমি ভয় পেতুম না। হ্যাঁ, তারপর কি ক'রে বাঁচলুম শোন,—যখন দেখলুম আমি জলে প'ড়ে গেছি তখন আর হাতের কাছে কিছু না পেয়ে সেই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই সাঁতরে চললুম। সাঁতরানো কি যায়! তবু সাহসে ভর ক'রে, বিপদকে তুচ্ছ ক'রে ঘণ্টা দেড়েক ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে লড়াই ক'রে ওপারে গিয়ে পৌঁছলুম।"

"উঃ আপনি কি সাংঘাতিক লোক স্যার! অতটুকু বয়সে আমরা তো একলা যেতে সাহসই করতুম না।"

"না বিজন, তোমাদের সবাইকে ঠিক আমার মতই সাহসী হ'তে হবে। স্কাউটরা ভয় ব'লে কিছু জানবে না, অসম্ভব ব'লে কিছু মানবে না। সকল রকম স্বার্থ ত্যাগ ক'রে যদি পরের উপকার করতে পার তবেই তোমাদের স্কাউট হওয়া সার্থক। বাঁচতে হ'লে মানুষ হয়েই বাঁচবে,—নিজের জন্যে, পরের জন্যে, দেশের জন্যে। ভীরু হয়ে ঘরকুণো হয়ে বাঁচার চাইতে না বাঁচাই ভালো।"

"আমাকে আপনার দলে নেবেন স্যার?"

এই কথা শুনে সবাই মুখ তুলে চায়। দেখতে পায়

ক্লাসের সব্বাইতে ভালো ছেলে, নাম যার আনন্দ, সেই ওই কথা বলছে। ছেলেরা তো অবাক হয়ে যায়। আনন্দ বলে কি!

ছেলেরা জানে আনন্দর স্বভাব। সে ক্লাসের শ্রেষ্ঠ ছাত্র। সব পরীক্ষায় প্রথম হয়ে আসছে ছোটবেলা থেকে। কেউ এ পর্যন্ত তাকে ডিঙিয়ে যেতে পারেনি। দিনরাত শুধু বই নিয়ে ব'সে থাকে। খেলাধূলো বড় একটা করেই না। এমনিধারা বহু খবরই ছেলেরা রাখে। তাই, সেই আনন্দর এই কথায় সবাই যে একটু আশ্চর্য হবে সে আর বেশি কি।

বিশুটা টিপ্পনী কেটে ব'লে ওঠে—"সে কি রে আনন্দ, তুই স্কাউট হবি কি রে! তোর পড়াশোনার ক্ষতি হবে না তাহ'লে?"

"না ভাই, তোমরা আমাকে আর ঠাট্টা ক'রো না। আমি আজ নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি, তাই ছুটে এসেছি তোমাদের কাছে। আজ আমি নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছি,—আর আমার কোনো ক্ষতিরই সম্ভাবনা নেই। শুধু পরীক্ষায় প্রথম হ'লেই চলবে না, আমাকে প্রথম হ'তে হবে সকল কাজে।"

আনন্দর উৎসাহ দেখে নিরঞ্জনবাবু খুশি হয়ে বল্লেন—"ঠিক, এই তো চাই! এস, আজ থেকেই তুমি আমাদের একজন হ'লে। শুধু একজন নও, আমি তোমাকেই দিলুম দলের নেতা ক'রে।" এই ব'লে নিরঞ্জনবাবু আনন্দর বুকে পরিয়ে দিলেন স্কাউটের ব্যাজ। ছেলেরা সমস্বরে ব'লে উঠল—

"Three Cheers for Ananda—Hip, Hip, Hurray !"

মাস খানেক পরের কথা।

স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে গেছে। দিন কয়েকের ছুটি পেয়ে নিরঞ্জনবাবু স্কাউটদের নিয়ে চ'লে গেলেন পাশেরই একটা গ্রামে। সেখানে স্কাউটদের ক্যাম্প বসল।

দিন কতক তারা বেশ হৈ চৈ ক'রে কাটিয়ে দিলে। ছেলেরা নিজেরাই সব কাজকর্ম করে। নিজেরাই রান্না করে, বাসন মাজে, জল তোলে, কাপড় কাচে। তাতেই ওদের কত আনন্দ।...মাছের ঝোলে হলুদ বেশি দিয়েছিল ব'লে বঙ্কু তো গোবিন্দকে মেরেই বসে আর কি! সেদিন কচুর শাকে নুন দেয়নি ব'লে বিশুটা মুখভঙ্গী ক'রে ব'লে ওঠে—"ছোঃ এগুলো কি আর মুখে দেওয়া যায়—গোবিন্দটা মোটে রান্না করতেই শেখেনি স্যার,—ওকে ডিসমিস্ ক'রে পটলাকে নিন ওর বদলে!"

নিরঞ্জনবাবু ওর কথা শুনে হাসেন।

সেদিন বিকেল বেলায় ছেলেরা কিছুক্ষণের জন্যে ছুটি পেয়ে বেরিয়েছিল গ্রাম দেখতে। নিরঞ্জনবাবুও ছিলেন না ক্যাম্পে। শুধু পাহারায় ছিল দলের কাপ্তেন আনন্দ। মাটিতে ব'সে সে একখানা কাগজ পড়ছিল। এমন সময়

দেখতে পেল দূরে একটা ছোট ছেলেকে তাড়া করেছে মস্ত বড় একটা ষাঁড়। ছেলেটা প্রাণের ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে চলেছে। কাউকে আর দেখতে না পেয়ে আনন্দ ছুটে চল্‌ল তার কাছে।

এর কিছুক্ষণ পরের কথা। ক্যাম্পের ছেলেরা আনন্দকে ঘিরে ব'সে আছে। নিরঞ্জনবাবু অনবরত তার মাথায় বাতাস দিচ্ছেন। আনন্দ দারুণ রকম আহত হয়েছে ছেলেটাকে বাঁচাতে গিয়ে। তার পরদিনই তারা চ'লে এল শ্যামপুরে।

আনন্দ এখন হাসপাতালে ক্রমশ সেরে উঠছে। নিরঞ্জনবাবু তার এই সৎসাহসের পরিচয় পেয়ে শতমুখে প্রশংসা করেছেন আনন্দর। এই বেদনার মাঝখানেও আনন্দর মুখে হাসিটি লেগেই আছে। পরের উপকার করতে পেরেছে ব'লে তার আজ কত আনন্দ।

তারপর বিকেলবেলা হাসপাতালে এসে উপস্থিত হ'লেন শহরের বিশিষ্ট কয়েকজন ভদ্রলোক। মহকুমার হাকিমও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। আজকে স্কুলে বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণ হয়ে গেছে। কিন্তু আনন্দ সেখানে উপস্থিত হ'তে পারেনি ব'লে হাকিম নিজে ব'য়ে এনেছেন তার পুরস্কার। আনন্দর জয়গানে মুখরিত হয়ে উঠল হাসপাতাল।

আনন্দ কী পুরস্কার পেয়েছিল জান? পেয়েছিল—দুটি সোনার মেডেল। একটি পেয়েছিল তার সৎসাহসের জন্যে, আর একটি পেয়েছিল পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে ব'লে।

হাকিম তার হাতে হাত রেখে বল্লেন—"তোমার মতো বীরের হাতে পুরস্কার তুলে দিতে পারছি ব'লে আমি গর্ব অনুভব করছি। শুধু বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হয়ে 'টি'কে' থেকে কোনো লাভ নেই—বীরের মতো যদি 'বেঁচে' থাকতে পার, তবেই জন্ম সার্থক।"

রাত তিনটের সময়

পূজোর ছুটি হ'তে না হ'তেই ছুটলুম দেওঘরে। সেখানে আমার এক 'দাদা রেলওয়ে স্টেশনে কাজ করেন। অ্যাসিস্টাণ্ট্ স্টেশন-মাস্টার। বছর চারেক সেখানে আছেন।

ইণ্টার ক্লাসে চলেছি, তবু ভিড়ের কমতি নেই। ছোট একটি কামরা, লোক বসবে চোদ্দ জন, কিন্তু চেয়ে দেখি চব্বিশ জনের কাছাকাছি। ভাগ্যিস্ আগে থাকতে স্টেশনে গিয়ে পৌঁছেছি তাই রক্ষে। নইলে শেষটা বোধ করি সারাটা পথ দাঁড়িয়েই যেতে হ'ত। তার ওপর সঙ্গে যদি কেউ থাকত তাহ'লেই গিয়েছিলুম আর কি! ভগবান সেদিক থেকেও রক্ষা করেছেন।

ট্রেন ছাড়বে, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন বুড়ো এক ভদ্রলোক। অন্য কামরায় জায়গা না পেয়ে যেই আমাদের কামরায় উঠতে যাবেন অমনি এক বিহারী তাঁকে লক্ষ্য ক'রে ব'লে উঠলেন, "নেহি নেহি, ইস্ কাম্‌রেমে নেহি,—যাইয়ে, উধার যাইয়ে।"

স্পষ্ট লক্ষ্য করলুম চোখে মুখে তার বিরক্তির ছাপ। সহযাত্রী অনেকেই বিহারী ভদ্রলোককে সমর্থন করলেন। কিন্তু আমি আর ব'সে থাকতে পারলুম না। ট্রেন ছাড়বার দেরিও নেই, অথচ বুড়ো ভদ্রলোকটি যদি উঠতে না পারেন হয়তো তাঁর যাওয়াই হবে না। আমি এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে তাঁকে বল্লুম, "আসুন, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন।"

এই ব'লে তাঁকে ওঠবার সাহায্যও করলুম। ট্রেনও একটু বাদেই চলতে শুরু করলে।

আমার জায়গাটিতে ভদ্রলোকটিকে বসতে দিয়ে আমি যেই একটি কাঠের বাক্সের ওপর বসতে যাব অমনি তার মালিকটি প্রতিবাদ করতে গেল। কিন্তু আমার পেশীবহুল দৈহিক গঠন দেখে বেশি কিছু আর বলতে সাহস করলে না। আমি চেপে বসলুম। গাড়ির কেউই আমাকে তেমন সুনজরে দেখছেন না, এটা স্পষ্টই বুঝতে পারলুম। কিন্তু সেদিকে নজর না দিয়ে আমি বুড়ো ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুললুম।

ভদ্রলোকটি বল্লেন, "আমার জন্যে তুমি কেন কষ্ট করতে গেলে বাবা। না হয় আজ নাই যেতুম।"

হেসে জবাব দিলুম, "তাতে কি হয়েছে। আমরা তরুণ, আমাদের কষ্ট কি। তাই ব'লে আপনি কেন কষ্ট পাবেন? আর যখন একসঙ্গে যাচ্ছি, তখন আপনাকে বেশ আরামেই নিয়ে যেতে পারব। আপনি একে বাঙালী, তার ওপর আমার দাদুর মতো আপনার বয়স, তখন কি চোখের সামনে আপনাকে দাঁড়িয়ে যেতে দেখব?"

স্পষ্টই বুঝতে পারলুম ভদ্রলোক খুশি হয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কি, অন্য কেউ উঠতে গেলে তাঁর প্রতি এতটা দরদ দেখাতুম কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই ভদ্রলোকটির বৃদ্ধত্ব ও চেহারার বিশেষত্বটাই আমাকে সব চেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছিল। তার ওপর তিনি বাঙালী। বাঙালীর সাহায্য যদি বাঙালী না করে, আর কে করবে।

ভদ্রলোকটির নাম শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। তিনিও দেওঘরে যাচ্ছেন। খুশি হয়ে বল্লেন, "তুমিও দেওঘরে যাচ্ছ? তবে তো ভালোই হোলো. একসঙ্গেই যাওয়া যাবে, কি বল?"

ব'লেই একটু হাসলেন। কিন্তু সে রকম হাসি সচরাচর কাউকে আমি হাসতে দেখিনি। ভারি বিশ্রী সেই হাসি। হাসতে গেলেই তাঁর চোখ-মুখের যা চেহারা হয়, সে ভারি

অদ্ভুত। তাঁর হাসিটাই শুধু অদ্ভুত নয়, চেহারাটাও যেন কেমন একটু অদ্ভুত ধরণের। নাকটা টিয়েপাখির ঠোঁটের মতো বাঁকা, চোখ দুটো ভেতর দিকে, কিন্তু অসম্ভব রকম উজ্জল। গাল দুটো টোল খাওয়া বলের মতো; সমস্ত মাথায় টাক। গায়ের রং অসম্ভব রকম কালো। পরনে খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবি আর কালো একটা চাদর। পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। হাতে একটা বর্মা-চুরুট। ভদ্রলোক বড্ড বেশি ধূমপান করেন।

আমার সঙ্গে আলাপ হ'তেই শিবশঙ্করবাবু ব'লে উঠলেন, "ও, তুমি হচ্ছ বিজয়ের ভাই? আরে আমি তো ওর কোয়ার্টারের সামনেই থাকি। বেশ হোলো। যে ক'দিন থাক, মাঝে মাঝে যেয়ো কিন্তু। খুব খুশি হব তাহ'লে।"

ব'লেই তিনি দাদার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। তাঁর মতে দাদা একজন আদর্শ যুবক। আর আমি যখন তারই ভাই, তখন শিবশঙ্করবাবুর প্রিয়পাত্র হ'তে আমার বেশিক্ষণ লাগল না।

বাক্স খুলে একটা কাগজের বাক্স আমার হাতে দিয়ে তিনি সেইরকম বিশ্রী হাসি হেসে ব'লে উঠলেন, "নাও খাও, ভীমনাগের সন্দেশ। ছেলেপুলে তো কেউ নেই, তাই বাড়ির পাশের ছেলেমেয়েদের ডেকে খাওয়াই। এই আমার একটা চিরকালের অভ্যেস। বুঝলে কিনা—হেঃ হেঃ হেঃ!"

আবার সেই বিশ্রী হাসি। ভদ্রলোকের ব্যবহার বেশ ভালো, কিন্তু ওই হাসিটাই বড্ড বেমানান। তাঁর সেই

স্নেহের দান হাত পেতে নিয়ে জবাব দিলুম, "কিন্তু আমি তো পাশের বাড়ির ছেলে নই ?"

—"নও কি রকম ? তুমি তো বিজয়ের ভাই, তুমিই আমার বেশি আপনার। বিজয়কে আমি কী ভালবাসি জান না তো। ও রকম ছেলে—"

আবার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবেন ভেবে আমি চট্ ক'রে অন্য কথা পাড়লুম। বল্লুম, "তা কলকাতায় গিয়েছিলেন কেন ?"

—"কেন আবার, ডাক্তার দেখাতে। পাকযন্ত্রটায় মরচে ধরেছে, তাই ভালো ডাক্তার দিয়ে একটু ঝালিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু সর্বনেশে ডাক্তাররা বলে কিনা অপারেশন করাতে হবে। কি সাংঘাতিক কথা বল তো ?" ব'লেই উত্তরের আশায় আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

হেসে বল্লুম, "তা ভালো হয়ে যাবেন ব'লেই তো বলেছে। আপনি খুব বুঝি ভয় পান অপারেশন করাতে ?"

—"কি বল্লে, ভয় পাই ? মোটেই না। কিন্তু কি জানো, ঐ কাটাছেঁড়ায় আমার বিশ্বাস নেই। কাটলে কখনো মানুষ ভালো হয় ? কই, তোমাদের ওই শরৎ চাটুজ্জে, রবি-ঠাকুরকে পারলে তারা বাঁচাতে ? অপারেশন তো বেশ বড় বড় ডাক্তার দিয়েই হয়েছিল। কিন্তু বাঁচল কি ?"

বুঝলুম, ভদ্রলোক অ্যালোপাথিক চিকিৎসার ওপর ঘোরতর অবিশ্বাসী, তাই আর সে প্রসঙ্গ না তুলে কথার মোড়টা দিলুম ঘুরিয়ে। বল্লুম, "যাক্ সে কথা, কিন্তু এই

বয়েসে আপনি কি একাই যাতায়াত করেন? সঙ্গে তো আর কাউকে দেখলুম না?"

আবার সেই রকম বিশ্রী হেসে শিববাবু জবাব দিলেন, "সঙ্গে আবার কে থাকবে? ছেলেপুলে কি বাঁচল একটা? ওই তোমাদের অপারেশন। সেই হোলো কাল। আজ যদি ছোটটাও বেঁচে থাকত, তাহলে এ্যাদ্দিনে সেও তোমার মতো জোয়ান হয়ে উঠ্ত।"

কণ্ঠস্বরে একটু করুণ ভাব লক্ষ্য করলুম। একটু থেমে আবার তিনি বলতে শুরু করলেন, "তাতে হয়েছে কি। তোমাদের মতো ছেলেরা থাকতে আবার ভাবনা! কলকাতায় গিয়ে যে মেস্টায় উঠেছিলুম, সেখানকার একটি ছেলেই তো আমার সঙ্গে একদিন ঘুরে ফিরে সব দেখালে। স্টেশনে সে-ই তো আমায় উঠিয়ে দিয়ে গেল। বাংলা দেশের ছেলেরা থাকতে আমার আবার ভাবনা!"

শিববাবু কথাটা এমন ক'রেই বল্লেন যেন সারা বাংলার ছেলেরাই ওঁর সন্তান। বৃদ্ধের অন্তরে যে কতখানি স্নেহ লুকিয়ে রয়েছে একদণ্ডেই তা বুঝতে পারলুম। এ রকম মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। আরও আলাপে জেনে নিলুম দেওঘরে এক বুড়ো চাকর আর এক নাতনী ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই। নাতনীটি তাঁর একমাত্র মেয়ের মেয়ে। মেয়েকে তিনি বিয়ে দিয়েছেন দিল্লীতে। তিনি সেখানেই থাকেন। মাঝে মাঝে বুড়ো বাপকে এসে দেখে যান। কিন্তু তাঁর মেয়েটি বড় হয়ে দাদুর কাছে এসেই থাকে। সেখানেই সে লেখাপড়া শেখে, দাদুর সেবাশুশ্রূষা করে।

যতক্ষণ ট্রেনের কামরায় ছিলুম ততক্ষণ শিববাবুর সঙ্গে আলাপ ক'রেই কাটিয়ে দিলুম। গল্প করতে ভ[illegible]র মোটে ক্লান্তি নেই। কত গল্পই যে হোলো তার আর ঠিক নেই। দেওঘরে পৌঁছে দাদাকে তিনি বারবার ক'রে ব'লে গেলেন যে রোজই যেন তাঁর সঙ্গে গিয়ে আলাপ ক'রে আসি, নইলে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন।

বহুদিন পরে দাদা বউদির সঙ্গে দেখা। তাঁরা আর ছাড়তে চান না। দাদা ডিউটি সেরে এসে গল্প করেন। আর বউদি তো দি[illegible] ধ'রেই। কাজেই, সময় ক'রে আর শিববাবুর ওখানে যেতে পারছি না।

বউদি হেসে বল্লেন "তোমার দাদু তো আর পালিয়ে যাচ্ছেন না। আজ দুদিন হোলো এসেছ, এত তাড়া কিসের? কাল সকালেই না হয় যেয়ো একবার।"

ভাবলুম সেই ভালো। দিনের বেলাটায় একটু গড়িয়ে নিই। ট্রেনের সেই কাঠের বাক্সের ওপর ব'সে আসতে সারা শরীরে যা ব্যথা হয়েছিল, তাতে ইচ্ছা সত্ত্বেও শিববাবুর সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারতুম কি না সন্দেহ। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলুম যে, ভদ্রলোকও তো একবার খোঁজ নিলেন না, যাঁর অমন অমায়িক ব্যবহার! কেমন যেন একটু খট্‌কা লাগল। ভাবলুম কালকে সকালে গিয়ে বেশ একটু অভিমান প্রকাশ ক'রে আসব।

রাত্রে দাদার কাছে শুনলুম শিববাবুর জ্বর হয়েছে

সেদিন রাত থেকেই। কিন্তু কাজের চাপে দাদাও আর দেখা করতে যেতে পারেননি। ওদের চাকরটা আজ এসে জানিয়ে গেছে। শুনে মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু রাত্রে আর গেলুম না। সারা শরীরে যা ব্যথা হয়েছিল, তাতে যাওয়ার আর শক্তি ছিল না। ভাবলুম, রাতটুকুই তো। কাল সকালেই গিয়ে বুড়োকে একবার দেখে আসব।

রাত্তিরে হাত-পায়ের ব্যথায় মোটেই ঘুম আসছিল না। জানালা দরজা বন্ধ ক'রে শুয়েছিলুম ব'লে ঘরটাও গরম হয়ে উঠেছিল। উঠে তাই মাথার কাছের জানালাটা দিলুম খুলে। বাইরে জ্যোৎস্না ফট্ ফট্ করছে। চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। এত রাত্রে কোনো ট্রেনও নেই। কাজেই স্টেশনেরও কোনো সাড়াশব্দ নেই। কিন্তু ও কি! সামনের বাড়িটার দোতলার বারান্দায় কে যেন পায়চারি করছে না? তাই তো! বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালুম। হ্যাঁ, আমার অনুমান সত্যি। এযে শিবশঙ্কর বাবু! এত রাত্রে, ও ভাবে হঠাৎ—! বুঝতে পারলুম না। ভালো ক'রে দেখবার চেষ্টা করলুম। না, শিববাবুই। ওই তো মাথাজোড়া টাক। সেই নাক, সেই তোবড়ানো গাল। এমন কি সেই পোশাকটি পর্যন্ত। সেই খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবি, চাদর। পায়ে সেই বিদ্যেসাগরী চটি।—ভারি অদ্ভুত ঠেকল। তিন দিন যাঁর জ্বর, তিনি কিনা এত রাত্রে এই বেশে! ঘাড় ফিরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালুম। ঘড়িতে তখন ঠিক তিনটে বেজে পাঁচ মিনিট। তাহ'লে রাত তিনটের

সময় তিনি ওপরে উঠেছেন। কিন্তু যেই আবার দেখতে চেষ্টা করলুম অমনি তিনি হন্ হন্ ক'রে নিচে নেমে গেলেন। ডেকে জিজ্ঞাসা করবারও সময় পেলুম না। শুধু দাঁড়িয়ে রইলুম সেই জানালার ধারে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে চ'লে যাবার সময় একবার তিনি আমার দিকে চেয়েছিলেন। সেই কোটরপ্রবিষ্ট উজ্জ্বল দুটি চোখ। একেবারে ট্রেনের সেই লোক!

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। কিন্তু তিনি আর উঠলেন না। তখন বিছানায় এসে শুয়ে পড়লুম, কিন্তু ঘুম আর এল না। সারা রাত্তির শুধু তাঁর কথাই মনে হোলো।

ভোরবেলা ব্যাপারটা দাদা-বউদিকে খুলে বলতে তাঁরাও খুব আশ্চর্য হ'লেন। বউদি ঠাট্টা ক'রে বল্লেন "স্বপ্নের ঘোরে কী দেখেছ তার ঠিক নেই, যত সব আজগুবি কথা!"

স্বপ্ন হ'লে আর কথা ছিল না। কিন্তু নিজের চোখকে অবিশ্বাস করি কি ক'রে? যাই হোক, তখুনি রওনা হলুম শিববাবুকে দেখতে। কিন্তু গিয়ে যা শুনলুম তাতে আর কথা, কইবার শক্তি রইল না! শিববাবুর নাতনীটি ব'সে খালি কাঁদছে, আর বুড়োচাকরটি তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। তার চোখেও জল। শুনলুম, কাল রাত তিনটের সময় শিববাবু হার্টফেল ক'রে মারা গেছেন।

—মারা গেছেন! রাত তিনটের সময়!

শুনে আমার কেমন যেন ভয় হোলো। শোকগ্রস্তা

নাতনীটিকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পেলুম না। পালিয়ে চ'লে এলুম।

বাসায় এসে অনেকক্ষণ চিন্তা করলুম। কিন্তু কিছুতেই ব্যাপারটার মীমাংসা করতে পারলুম না। এ যুগের ছেলে আমি, ভূতটুত আছে ব'লে কোনোদিন বিশ্বাস করিনি, আজও করি না। কিন্তু কেন এমন হোলো? মনে হোলো স্নেহশীল বৃদ্ধ যেন যাবার সময় আমাকে একবার দেখে যেতেই ওপরে উঠে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আর একবারটি দেখা হোলো না ব'লে অনুশোচনায় সারা মন ভ'রে গেল। মনে হোলো আমি দারুণ অন্যায় করেছি। —কিন্তু ব্যাপারটা কি সত্যি, না আমার চোখের ভ্রম?

ভাইফোঁটা

বাপ-মা মারা যাবার পর বিশু আশ্রয় পেল মামার বাড়িতে। বয়স তখন তার বছর দশেক। সেই থেকে সে মামার কাছেই আছে।

বিশু আশ্রয় পেয়েছিল বটে, কিন্তু মোটেই সেটা সুখের হয়নি। মামার দয়া সে পেয়েছিল কিন্তু আদর পায়নি কখনো। তার ওপর ছিল মামীমার অত্যাচার অবিচার। মুখ বুজে তাকে সকল কষ্ট সইতে হোতো। বাড়িতে চাকর ছিল না—তাই মামীমা তাকে দিয়ে সংসারের এমন অনেক কাজই করিয়ে নিতেন, যা অতটুকুন ছেলের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। তবু বিশুকে মামীমার হুকুম তামিল করতে হোতো সব সময়। নইলে লাঞ্ছনা গঞ্জনার আর সীমা থাকতো না।

বৈঠকখানার পাশেই ছোট্ট একটি কুঠুরী। তাতেই বিশুর থাকবার জায়গা। তক্তপোষের এক ধারে সে শোয়, আরেক ধারে সাজিয়ে রাখে তার বই পত্তর সব। মামীমার ঘরে খান দুই টেবিল অমনি প'ড়ে ছিল কিন্তু তার থেকে একটিও আনবার জো নেই। একদিন সে চেয়েছিল, মামীমা অমনি বলেছিলেন—"অত সখে কাজ নেই। নবাব-পুত্তুর আমার। টেবিল না থাকলে বাবুর আমার পড়া হয় না। উঃ সখ দেখে আর বাঁচি না। বলে না, পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ি।"—সেই থেকে কারুর কাছেই বিশু কিছু চায় না।

দিনের বেলায় বিশুর একরকম পড়াশোনা হয় না বল্লেই

চলে। কখন্ আর করবে বল! সকালে ঘুম থেকে উঠেই ঢুকতে হয় রান্নাঘরে। চা ক'রে, সকলের জলখাবার দিয়ে, মামীমাকে ডেকে সে পড়তে যায়। কিন্তু পড়তে যেতে না যেতেই ডাক আসে ভিতর থেকে। 'যা তো বিশু, দৌড়ে' বাজার থেকে এগুলো নিয়ে আয়।'— মামীমা বলেন। না হয় মামাবাবু বলেন—'যা তো বিশু, দৌড়ে' পোস্টাফিস গিয়ে এই চিঠিখানা পোস্ট ক'রে আয়।' এই ভাবে ফরমাস খাটতে খাটতেই সারা সকালটা যায় কেটে। তারপর নাকে মুখে কিছু গুঁজেই ইস্কুলে যেতে হয়।

কতদিন বিশু খেতে ব'সে দেখেছে মামীমা তাঁর ছেলেদের বেছে বেছে মাছ দিয়েছেন, দুধ দিয়েছেন বাটি ভ'রে, ঘি দিয়েছেন পাতে। কিন্তু বিশুকে ভুলেও কখনো একফোঁটা ঘি বা এতটুকু দুধ দেননি তিনি। খেতে ব'সে কোনোদিন যদি দু'মুঠো ভাত বেশি চায় মামীমা অমনি ঝঙ্কার দিয়ে ব'লে ওঠেন—"কাজ করবার মুরোদ নেই, গেলবার মুরোদ আছে তো খুব! বলি, এত সব আসে কোত্থেকে?" এ-কথা শুনে কারুর কি আর চাইবার প্রবৃত্তি থাকে, না, খেতে ইচ্ছে যায়? মাঝে মাঝে মামার ছোট ছেলে রমেশ যদি এ সব শুনে প্রতিবাদ করতে যায় মামীমা তক্ষুনি তাকে ধমক দিয়ে ব'লে উঠবেন—"তুই চুপ কর্ হতভাগা! আমার সঙ্গে আবার তর্ক!" বাধ্য হয়ে রমেশ থাকে চুপ ক'রে আর আধপেটা খেয়েই উঠে যেতে হয় বিশুকে।

একবার বিশুর অসুখ করেছিল খুব। তিন দিন এক-রকম অজ্ঞান অবস্থায় ছিল প'ড়ে। একটিবারের তরেও মামীমা এসে খোঁজ নেননি তার। মামাবাবু ডাক্তার ডেকে এনেছিলেন ব'লে মামীমা তাঁকে বলেছিলেন—"পরের ছেলের জন্যে খুব যে দরদ! এদিকে বাতের ব্যথায় আমি যে ম'রে যাচ্ছি সেদিকে নজর নেই একটিবারও!" সেই থেকে মামাবাবুও আর আসতেন না। বাড়ির সব্বাই মামীমাকে ভয় ক'রে চলতো।

মামার ছোটছেলে রমেশই তার যা একটু খোঁজ-খবর নিতো। কিন্তু তাই কি সে রোজ পারতো? মায়ের ভয়ে তাকে আসতে হোতো লুকিয়ে। টের পেলে বিশুর মামীমা তাঁর নিজের ছেলেকেও আস্ত রাখতেন না। বড়ছেলে বঙ্কু ছিল ডানপিটে আর শয়তান। মিথ্যে নালিশ ক'রে মায়ের কাছে বিশুকে নিয়ে গিয়ে সে মার খাওয়াতো, আর হাসতো তার কান্না দেখে। বিশু তাই বঙ্কুকে ভয় করতো খুব, আর যতদূর সম্ভব তাকে এড়িয়ে চলতো।

এমনি ক'রেই চলছিল বিশুর জীবন নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়ে। মাঝে মাঝে এ-সংসারের ওপর ঘৃণায় তার মন উঠতো বিষিয়ে—কিন্তু কী করতে পারে সে। কতটুকুই বা তার শক্তি। মাঝে মাঝে সে ভাবতো—আজ যদি তার মা থাকতেন বেঁচে, তাহ'লে কি এত অনাদর এত অবজ্ঞা সইতে হোতো তাকে? কিন্তু ভাগ্য তার মন্দ।

স্কুলের ছুটি যখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে তখন একদিন হঠাৎ কলকাতা থেকে বিশুর মামার এক সম্পর্কীয় বড়ভাই আর তাঁর মেয়ে উমা এলো বেড়াতে পবিত্রপুরে অর্থাৎ বিশুদেরই গাঁয়ে।

উমাকে দেখে বিশুর মামীমা বল্লেন—"ভালোই হোলো, তুই ঠিক ভাইফোঁটার আগেই এসে পড়েছিস্ উমা। বঙ্কু আর রমেশ কতদিন বলেছে, এবার কে আমাদের ফোঁটা দেবে মা। ওদের তো বোন নেই। এক আছিস্ তুই। তাও এলি কতো জন্ম পরে!"

হেসে উমা বল্লে—"সেইজন্যেই তো এলুম কাকীমা। আমারও তো ফোঁটা দেবার কতো সখ। তাইতো বাবাকে নিয়ে ছুটে এলুম তোমাদের এখানে। ভাইফোঁটাও দেওয়া হবে আর সেই সঙ্গে তোমাদের এই জায়গাটা কখনো দেখিনি সেটাও দেখা হয়ে যাবে!"

"একসঙ্গে রথ দেখা আর কলা বেচা দুই-ই, না উমাদি?"—রমেশ ব'লে উঠলো।

হেসে উমা জবাব দিল—"হ্যাঁ, সত্যিই তাই। তুই তো বেশ কথা কইতে শিখেছিস্ রমেশ! আগে তো কলকাতায় গেলে বোবার মতো চুপটি ক'রে ব'সে থাকতিস্!"

•

রান্নাঘরে বিশু তখন চা করছিল। উমা তার কাকীমার সঙ্গে গল্প করতে করতে ঢুকলো এসে সেই ঘরে। কাকীমা বল্লেন—"এটি হচ্ছে আমার ভাগ্নে

বিশু। বাপ-মা-হারা ছেলে। এত আদর যত্ন করি—কিন্তু করলে কি হবে—ছোঁড়া বেজায় কুড়ে। সেই কখন্ চা করতে ঢুকেছে এখনো ওর চা করাই হোলো না।"

বিশুর পানে তাকিয়ে উমা বল্লে—"বা-রে, ও কখনো চা করতে পারে? একেবারে ছেলেমানুষ যে!—তুমি ওঠো তো বিশু, আমি চা ক'রে দিচ্ছি।"

উমার কাকীমা অম্নি হাঁ হাঁ ক'রে উঠলেন,—"আরে, তুই করবি কি রে! ও-ই তো রোজ চা করে—"

"আজ না-হয় আমিই ক'রে দিই কাকীমা। ভারি তো একটু চা।" এই ব'লে উমা বিশুর হাত থেকে চায়ের কেৎলিটা নিয়ে চা ছেঁকে ফেল্লে। তারপর বিশুর হাতে দু'কাপ চা দিয়ে বল্লে—"যাও তো ভাই, ও ঘরে বাবা আর কাকাবাবু ব'সে আছেন তাঁদের এ দু'কাপ দিয়ে এসো।" বিশু চা নিয়ে চ'লে গেল। বিশুর মামীমা তখন উমার জন্যে রেকাবীতে খাবার সাজিয়ে তার সাম্নে এনে দিলেন আর বল্লেন—"নে বাছা, এ দুটো তুই মুখে দিয়ে নে। আমি যাই, তোর বাবাকে ও ঘরে খাবারটা দিয়ে আসি।" খাবার নিয়ে তিনি চ'লে গেলেন; বিশু এসে ঢুকলো রান্নাঘরে।

উমা বল্লে—"এসো ভাই, বোসো এইখানে। দু'জনে খেতে খেতে গল্প করি এসো।"

নতমুখে বিশু জবাব দিল—"না, আপনিই খান, আমি এখন খাবো না।"

"ছিঃ, দিদির কথা বুঝি ফেল্তে আছে? এসো, লক্ষ্মী ভাইটির মতো যা বল্ছি শোনো।"

উমার এই স্নেহের ডাকে বিশু এসে বসলো উমার কাছে। কই, এ বাড়ির আর কেউ কখনো বিশুকে তো ঐ ভাবে ডাকেনি। আদর ক'রে কেউ তো কখনো নিজের খাবার থেকে তাকে একটু কিছু দেয়নি। আর যে-উমাদি তাকে কোনোদিন দেখেনি, চেনে না, সে কিনা এসেই তাকে স্নেহের বাঁধনে বেঁধে ফেল্লে! বিশুর মন আনন্দে নেচে উঠলো কৃতজ্ঞতায়, শ্রদ্ধায় সে চাইলো উমার দিকে। উমা জিজ্ঞাসা করলো—"রোজ সকালে তোমরা কী খাও বিশু?"

"আমি তো কিছু খাই না উমাদি।"

"কেন?"—বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলো উমা।

এর উত্তরে বিশু কী বলবে ভেবে পেলে না। মামীমা যে সকাল বেলা তাকে কিছুই খেতে দেন না একথাই বা সে বলবে কেমন ক'রে। তাই সে জবাব দিলো— "আমার তেমন ক্ষিদে পায় না, তাই!"

উমা চালাক মেয়ে। একটুতেই সে বুঝে নিলো সব। তার কাকীমা যে বাবা-মা-হারা ছেলেটিকে কী কষ্টেই রেখেছেন তা' বুঝতেও তার দেরি হোলো না। সে দেখেছে, যখন তারা মোটর থেকে নামে তখন ঐ বিশুই তাদের মোটঘাট সব বয়ে নিয়ে যায় বাড়ির ভিতর। তখন কি উমা জানতো—বিশু কে!

সন্ধ্যেবেলা বিশু তার ঘরে ব'সে ছিল। ভাবছিলো

এই উমাদির কথা। আজ সকালে তার যে স্নেহের পরিচয় সে পেয়েছে—সে যে তার কাছে নিতান্তই দুর্লভ। বিশু ভাবলো উমাদি তার কতো আপনার জন। ঠিক সেই সময়ে উমা এসে ঢুকলো বিশুর ঘরে।

"তোমার ঘর দেখতে এলুম বিশু। এই ঘরে তুমি থাকো?"

"হ্যাঁ উমাদি, এইতো আমার থাকবার জায়গা।"

"এতটুকুন ঘরে বুঝি কেউ থাকতে পারে?"

"এতেই আমার চ'লে যায় উমাদি!"

"না, চলে না।" উমা ব'লে উঠলো। "আমার কাছে লুকিয়ে কী হবে ভাই, আমি সবই বুঝতে পেরেছি। কাকীমা যে কোন্ প্রাণে তোমাকে এমন কষ্টের মাঝে রেখেছেন আমি ভাবতেও পারি না। তুমি না বল্লেও আমি তা' বুঝতে পারি।···একটা কথা বল্‌বো, বিশু?"

"বলুন।" বিশু জবাব দিলো।

"আমাদের সঙ্গে তুমি যাবে?"

"কোথায় উমাদি?"

"কেন, কলকাতায়, আমাদের বাড়িতে। সেখানে তোমার এই দিদির কাছে থাকবে, পড়াশুনো করবে। আর আমিও একটি ভাই পেয়ে কী মজাতেই থাকবো। কেমন, যাবে তো বিশু ভাই?"

উমার কথায় বিশু আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো। সেও তো তাই চায়। নির্দ্দয় এই পাষাণপুরী থেকে মুক্তিই তো তার কাম্য। বিশুর মনে হোলো ভগবান্ যেন তাকে

এই কষ্টের ভিতর থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই পাঠিয়েছে ন স্নেহময়ী এই উমাদিকে।

বিশু বল্লে—"যাবো উমাদি, যাবো।"

পরদিন ভাইফোঁটা। বঙ্কু সকাল থেকেই তাড়া দিচ্ছে—"কই উমাদি, তোমার হোলো? ফোঁটা নিয়েই আমায় এক্ষুনি বেরুতে হবে সাইকেল নিয়ে। আজকে আবার ক্যারমের সেমি-ফাইনাল কিনা।" রমেশও স্নান সেরে অপেক্ষা করছে ফোঁটা নেবার জন্যে।

বিশুর মামীমা তখন রান্নাঘরে ছেলেদের জন্যে খাবার সাজাচ্ছেন থালা ভ'রে। উমা ফোঁটা দেবে বঙ্কু আর রমেশকে—সেই সঙ্গে খাবারও তো দিতে হবে তাদের।

"তোমার হোলো কাকীমা? এদিকে আমার সব তৈরী।" বল্‌তে বল্‌তে উমা এসে ঢুকলো রান্নাঘরে।

"এই হোলো বাছা। একা আর ক'দিক সামলাবো বল্। বিশু হতভাগাটার আজ পাত্তাই নেই। কোথায় যে গেল—আসুক একবার বাড়ি—"

হেসে উমা বল্লে—"তা আমাকেও তো ডাক দিতে পারতে কাকীমা। নাও, তুমি দুটো ডিস্ নিয়ে যাও, আমি আরেকটা ডিস্ সাজিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।"

"আরেকখানা ডিস্ দিয়ে আবার কি হবে রে?"—বিস্ময়ের সঙ্গে উমার কাকীমা উমাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

"বা-রে! আমার যে আরেকটি ভাই আছে—তাকে বুঝি খেতে দিতে হবে না?"

"আরেকটি ভাই! সে আবার কে রে?"

"চলনা, গেলেই দেখতে পাবে।" উমার চোখে-মুখে হাসি ফুটে উঠলো কথা বলতে বলতে।

যখন তারা এসে ঘরে ঢুকলো তখন বঙ্কু আর রমেশের সঙ্গে বিশুও ব'সে আছে তার উমাদির হাতে ফোঁটা পাবার জন্যে। সবার আগে বিশুকেই ফোঁটা দিলো উমা, চন্দন

দিয়ে। মাথায় দিল ধানদূর্বা—সে যেন তার অন্তরের স্নেহাশীর্বাদ। মাথা হেঁট ক'রে বিশু প্রণাম করলো উমাকে। তখন আর কেউ লক্ষ্য না করুক উমা লক্ষ্য করেছিলো বিশুর মুখখানা আনন্দের আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

উমা তখন হাসিমুখে বল্লে—"এখন তো দেখতে পেলে কাকীমা, আমার ভাইটি কে?"

সাইরেন-বিভ্রাট

পাড়ার ছেলেদের এক গোপন-বৈঠক বসেছে হাবুলদের বাড়িতে। পটলা নন্তু ফণী স'তে বিশে কেউই বাদ যায়নি আজ। কি ক'রে ঐ হাড়-কিপ্টে মধু ঘোষালের বাগান থেকে আম লিচু চুরি ক'রে আনা যায় এই নিয়ে চলছে পরামর্শ।

কি বল্লে, মধু ঘোষালকে চেন না? তাহ'লে চিনলে কি! তাঁর দর্শন যদি পেতে চাও, তাহ'লে এক কাজ ক'রো। সকাল আটটায় সোজা চ'লে যেয়ো লেকমার্কেটে, তাহ'লেই দেখবে মধুবাবু আসছেন। না, না, কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না, তাঁকে দেখলেই চিনতে পারবে। অমন চেহারা আর সে তল্লাটে নেই। গোলগাল বেঁটে মোটা শরীর। মাথায় দিব্যি চক্‌চকে একটি টাক। পরনে স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ, অর্থাৎ আটহাতি এক ধুতি—হাঁটুর ওপরে উঠেছে। গায়ে একটি ফতুয়া, আর পায়ে রিফু-কর্মকরা পাঁচবছরের একজোড়া ঠন্‌ঠনে চটি। এই হ'লেন আমাদের মধু ঘোষাল।

ভদ্রলোক সত্যি ভারি কঞ্জুস। অগাধ টাকা আছে। কিন্তু খরচের বেলায় হাত দিয়ে জল গলে না। বেজায় হুঁশিয়ার। এদিক ওদিক হয়েছে কি ঘোষালের মাথায় বজ্রাঘাত। যক্ষের মতো টাকা আগলে থাকতেই তাঁর বেশি আনন্দ। তাই দু'হাত দিয়ে খালি জমিয়েই যাচ্ছেন। সংসারে থাকার মধ্যে আছে এক স্ত্রী, এক উড়ে মালী আর

খোট্টা দরোয়ান। আরও একটি জিনিস আছে, সেটি হচ্ছে তাঁর বাগান। মালী আর দরোয়ানও তাঁকে রাখতে হ'তো না, রাখতে হয়েছে শুধু ঐ বাগান পাহারার জন্যেই।

ঐ রকম কঞ্জুস মানুষের কি ক'রে যে বাগান করবার সখ হোলো তা' জানি না। কিন্তু তাঁর বাগানটি সত্যি ভারি লোভনীয়। কত রকম ফলের গাছ যে সে-বাগানে আছে তার ঠিক নেই। গরমের সময় তো আম, জাম, লিচুর ছড়াছড়ি। কিন্তু কি স্বভাব, কাউকে ডেকে কখনো সে ফল খেতে দেবেন না। ফলের ওপর তাঁর এম্‌নি মায়া! নিজেরা হয়তো খেয়ে শেষ করতে পারবেন না, তবু পাড়া-পড়শীকে ডেকে বিলিয়ে দেওয়া—তাও তিনি কখনো পারবেন না!

কিন্তু তাই ব'লে পাড়ার ছেলে-ছোকরারা শুনবে কেন? একে মধুবাবু তো পাড়ার সার্বজনীন পূজোয় চাঁদা দেন না, তার ওপর তাঁর বাগানের পাশ দিয়ে গেলেই তাদের জিভে আসে জল,—কাজেই মধুবাবুকে জব্দ করতে হ'লে ফল চুরি করা ছাড়া আর উপায় কি। চোখের সাম্‌নে আম পাকবে, জাম পাকবে, লিচু পাকবে—আর তারা তাই সতৃষ্ণ নয়নে শুধু চেয়ে দেখবে—এও কি কখনো হয়! তাই ছেলেরা উঠে প'ড়ে লেগে গেছে মধু ঘোষালকে জব্দ করতে।

পটলা বল্লে—"বাব্‌বাঃ, যা বদ্‌রাগী মানুষ, একবার ধরতে পারলে আর আস্ত রাখবে না। আর তাছাড়া পাহারা যা রেখেছে, কার সাধ্যি বাগানে ঢোকে!"

নন্তু বল্লে—"কিন্তু ঢুকতে আমাদের হবেই। ঐ কিপ্টে ঘোষালকে জব্দ না ক'রে ছাড়ছি না। একা একা ফল খাওয়ার ফলটা বেরুবে এবার।"

ফণী বল্লে—"কিন্তু এ তোমাদের অন্যায়। বাগানটা হোলো ওর, আর ফলের দাবী করছ তোমরা। এ কি ক'রে—"

তাকে থামিয়ে দিয়ে নন্তু ব'লে ওঠে—"আলবাৎ দাবী করব। একশোবার দাবী করব। ভদ্রলোকের ছেলে নেই পুলে নেই—লোক তো মোটে চারজন। চারজনের জন্যে আর কতো ফল দরকার হয় রে বাপু! চোখের সামনে পেকে প'চে যাবে, তবু কিনা আমরা পাড়ার ছেলে হয়ে খেতে পাব না?"

নন্তুর কথার সমর্থন ক'রে স'তে ব'লে ওঠে—"সত্যি, এ কখনোই হ'তে পারে না। আমরা যেমন ক'রেই পারি বাগানে ঢুকব।"

বিশে এতক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে ছিল এককোণে। এবার তার মুখ খুল্‌ল—"নিশ্চয়ই!—কিন্তু কি ক'রে ঢুকব, সেটা তো ঠিক হোলো না এ-পর্যন্ত?"

নন্তু জবাব দিল—"সেজন্যে ভাবতে হবে না। মামা শিখিয়ে দিয়েছেন সব।" এই ব'লে সে সবাইকে শুনিয়ে দিলে তার মামার প্ল্যান। । শুনে তো সবাই হেসেই অস্থির। পটলা বল্লে, "সত্যি, হাজার হোক্ মামার বুদ্ধি আছে! আচ্ছা জব্দ হবে বুড়ো!

এর পরদিনের কথা।

বেলা তখন দুটো কি তিনটে হবে। মালী আর দরোয়ানটাকে সঙ্গে নিয়ে মধু ঘোষাল গেছেন বাগানে। লিচুগুলো বেশ পেকেছে, সেগুলো পেড়ে আনতে হবে। বাহারাম মালী তখন গাছে। আর, নিচে দরোয়ান আর বাবুতে মিলে শুরু করেছেন লিচু কুড়োতে। এমন সময় হঠাৎ এক কাণ্ড।

'পোঁ…ওঁ…ওঁ…ওঁ…!' খাপছাড়া ভাবে অতর্কিতে সাইরেন উঠলো বেজে। আর যায় কোথা! মধু ঘোষালের বুকের মধ্যে তখন মেদিনীপুরের ঝড় বইছে। ঊর্ধ্বশ্বাসে তিনি ছুটলেন। লিচুর ঝুড়িটা কিন্তু নিতে ভোলেননি। এমন সময় আবার শব্দ হোলো হুম্-হুম্-হুম্ !!! তখন রইলো প'ড়ে লিচুর ঝুড়ি,—মুক্তকচ্ছ হয়ে মধু ঘোষাল মারলেন চোঁচা দৌড়! বলা বাহুল্য, মালী আর দরোয়ান আগেই পালিয়েছিল।

একতলার ছোট্ট ঘরটায় ঢুকে মধুবাবু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। একটু পরেই দেখতে পেলেন তাঁর স্ত্রী আগেই এসে ঢুকেছেন শেল্টারে। স্ত্রীকে দেখেই মধুবাবু ব'লে ওঠেন—"নাও, হোলো তো? খাও এখন! তোমাকে না পই পই ক'রে বলেছিলাম লিচুগুলো পাড়াও—তা তো আর করলে না, এবার বোঝ!"

স্ত্রীও তেমনি ঝাঁঝালো স্বরে জবাব দেন—"চুলোয় যাক্ তোমার লিচু। এদিকে আমি যে ছাতে আচার

তকুতে দিয়ে এসেছি। সেগুলো—" কিন্তু কথা আর শেষ হোলো না। অমনি আবার শুরু হোলো হুম্-হুম্-হুম্।

হরিনাম জপ করতে করতে মধুবাবু অনুচ্চকণ্ঠে ব'লে উঠলেন—"সেরেছে! আজ আর কলকাতা রাখলে না দেখছি! দিনদুপুরেই দিলে শেষ ক'রে। · হতভাগা

খাঁদানাকওয়ালাগুলোর বুদ্ধিশুদ্ধি ব'লে যদি কিছু থাকে! বোমা ফেলবার কি আর সময় পেলি না রে বাপু! সময় নেই, অসময় নেই, এলেই হোলো!"

অর্থাৎ মধুবাবুর মতে লিচু কুড়োবার সময় বোমা ফেলাটা নিতান্তই অর্বাচীনের কাজ। বোমা যদি ফেলতেই হয়, তাহ'লে গভীর রাত্রে ফেল্‌লেই তো চুকে যায়। তা নয়, কাজের সময় যতসব ঝামেলা। মধুবাবু রাগে জ্বলছিলেন। কিন্তু যারা আসবার তারা সময় বুঝেই আসে!

মধুবাবু আর তাঁর স্ত্রী দরজা জানালা বন্ধ ক'রে সেই থেকে বসেই আছেন। 'অল্‌-ক্লিয়ার'-ও তো ছাই বাজে না! বেলা গড়িয়ে যে সন্ধ্যে হয়ে এলো! মধুবাবু আর থাকতে পারছিলেন না, তাঁর স্ত্রীও অস্থির হয়ে উঠেছেন। এমন সময় কে যেন বাইরে থেকে ডাকলো—"ওহে ঘোষাল! ঘোষাল! ব্যাপার কি? দরজা খোলো।"

মধুবাবু তো অবাক! কে তাঁকে ডাকছে এই বোম্বিং-এর সময়! দরজা খুলতে তাঁর সাহস হোলো না। কি জানি, যদি জাপানীরাই হয়! বলা তো যায় না। কিন্তু ওদিকে ডাকও থামছে না। শেষটা জানলা ফাঁক ক'রে দেখেন পাড়ার বিরূপাক্ষ ক'বরেজ! ট্রামও চলছে, বাস্‌ও চলছে, রাস্তা দিয়ে লোকজন যাতায়াত করছে।

মধুবাবু ভেবে পেলেন না ব্যাপারখানা কি! "তবে কি অল্‌ক্লিয়ার দিয়ে দিয়েছে?"—এই ব'লে তিনি সাগ্রহে কবিরাজ মশায়ের দিকে তাকালেন। কবিরাজ বল্লেন—

"অলক্লিয়ার আবার কিসের হে? সাইরেন বাজলো কখন্ যে, অলক্লিয়ার হবে?"

শুনে তো মধুবাবু আর তাঁর স্ত্রী অবাক্। তবে কি কেউ দুষ্টুমি করলো? এই ভেবে তিনি তক্ষুনি ছুটলেন বাগানে, আর তাঁর স্ত্রী ছুটলেন ছাতে। বাগানে গিয়ে তো মধুবাবুর চক্ষু চড়কগাছ! সমস্ত বাগান ফাঁক! একটি লিচুও নেই। আমগুলোও সব উবে গেছে কর্পূর হয়ে। কিন্তু সেই সঙ্গে পেলেন একটুকরো চিঠি। তাতে লেখা ছিল—

"ক্ষুধার্ত সৈন্যদের জন্য যে আম ও লিচু লইয়া গেলাম, সেজন্য দুঃখ করিবেন না। ইহার বদলে আমরা আর কখনও আপনার গৃহে বোমা ফেলিতে আসিব না। আপনি নির্ভয়ে থাকুন।—আপনাকে এ-বছর আর বিরক্ত করিব না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আস্‌ছে বছর যেন ঠিক এমনই ফল ধরে। ইতি—খাঁদানাকওয়ালা।"

কি সাংঘাতিক! চিঠি পেয়ে মধু ঘোষালের যেন হৃৎকম্প উপস্থিত হোলো। জাপানীরা কিনা বেছে বেছে তাঁর বাগানেই হানা দিয়ে গেল! যাক্ তবু রক্ষে, প্রাণে মারেনি এই যা! মধুবাবু তখন জাপানীদের উদ্দেশে প্রণাম জানালেন।

আসলে ব্যাপারটা যে কি হয়েছিল, তোমাদের মতো চালাক পাঠকেরা তা' নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ, তাই না?

এ সবই হচ্ছে নন্তু পটলাদের কাণ্ড। মুখে মুখে সাইরেন বাজিয়ে, মধুবাবুকে ভয় দেখিয়ে তারা কার্যোদ্ধার ক'রে চ'লে গেল। আর, ঐ দুম্ দুম্ শব্দ? ওটাও ওদেরই কারসাজি। যখন ওরা বুঝতে পারলে যে, মধুবাবু লিচুর ঝুড়িটা নিয়ে স'রে পড়ছেন, ওদের মধ্যে থেকে স'স্তে তখন বুদ্ধি খাটিয়ে কতকগুলো ডাবের খোলা নিয়ে ছুড়ে মারতে লাগলো পাঁচিলের গায়ে। আর তার ফলেই ওরকমের আওয়াজ হওয়ায় মধুবাবু গেলেন ভয় পেয়ে! বাগানে ঢুকেও ওরকম শব্দ ওরা দু-তিনবার আরো করেছিল। পাছে মধুবাবুর মনে সন্দেহ জাগে এই জন্যে বোমাপড়বার নকল শব্দ ক'রে ওরা কার্যসিদ্ধির উপায়টা আরো সহজ ক'রে নিয়েছিল। সেদিন ওদের মজা দেখে কে!

হ্যাঁ, আরো একটা কথা কানে কানে এই ফাঁকে ব'লে রাখি। নন্তুর মামা, যিনি এর মূলে, অর্থাৎ যাঁর পরামর্শে এরা মধুবাবুকে জব্দ ক'রে চম্পট দিল—তিনি হচ্ছেন তোমাদেরই এই গল্পলেখক! কিন্তু দোহাই তোমাদের, কথাটা যেন আবার মধুবাবুর কানে তুলো না। ভদ্রলোক তাহ'লে মনে বড় ব্যথা পাবেন। [illegible] হোক, একই পাড়ায় থাকি তো!

শেষ

আমাদের প্রকাশিত শিশু-সাহিত্য

হেমেন্দ্রকুমার রায়

[illegible] (Alice in Wonderland) ॥৴০

[illegible] (উপন্যাস) ৸৴০

মড়ার মৃত্যু ঐ ।৴০

সুনির্ম্মল বসু

শুজয়ের জন্ম ॥০

আদিম দ্বীপে (উপন্যাস) ।০

বুদ্ধদেব বসু

গল্পঠাকুরদা

একপেয়ালা চা ॥০

পথের রাত্রি ।৴০

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ব্যোমদাসের মাদুলি

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

মানুষের উপকার কর

শিবরাম চক্রবর্ত্তী ও

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

জীবনের সাফল্য ॥০

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি ।০

যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

মায়ের গৌরব (উপন্যাস)

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

দুর্গম পথে ৸০

বন্দে আলী মিয়া

তিন আজগুবি ॥০

রবীন্দ্রলাল রায়

বীরবাহুর বনিয়াদী চাল ॥০

শিবরাম চক্রবর্ত্তী ও

ধ্রুবেশ চন্দ্র অধিকারী

এক রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার ॥০

সুবিনয় রায় চৌধুরী

বল তো (ধাঁধার বই) ৸০

প্রভাতকিরণ বসু

রাজার ছেলে (উপন্যাস) ৸০

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

পাতালপুরের আংটি (উপন্যাস) ৸০

সুধাংশু দাসগুপ্ত

বুদ্ধির লড়াই ॥০

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

কল্পলোকের কথা ॥৴০

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

কায়াহীনের প্রতিশোধ ॥৴০

সুকুমার দে সরকার

অরণ্য রহস্য (উপন্যাস) ॥০

শৈল চক্রবর্ত্তী

বেজায় হাসি (কবিতার বই) ॥৴০

দীনেশ মুখোপাধ্যায়

অচিন দেশের রাজকন্যা

(রূপকথা) ॥০

ধর্ম্মদাস মিত্র

খাদে ডাকাতি ॥০